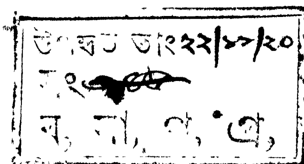
ভারতবাণী



ভারতবাণী।

শ্রীহরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

প্রকাশক,

চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং,

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

PRINTED BY K. C. GHOSE AT THE LAKSHMI PRINTING WORKS,
64-1 & 64-2. SUKEA'S STREET, CALCUTTA.

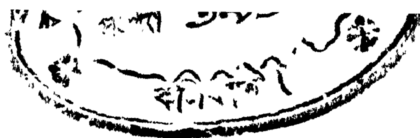
ভূমিকা ।

এই পুস্তক প্রকাশে ভূমিকাস্বরূপ বিশেষ বক্তব্য আমার কিছুই নাই ; তবে স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ পণ্ডিত নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে, বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া, যেরূপ ভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য, প্রারম্ভে তাঁহাকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইতি—

সন ১৩২০ সাল
৭ই ভাদ্র।

শ্রীহরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ।

সূচীপত্র।



ভারত-বাণী।

যাহা নাই ভারতে
তাহা নাই জগতে।

ভারতবর্ষে যাহা নাই—আমাদের মায়ের যাহা নাই—তাহা সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়াও পাইব না। এ কথাটী বড়ই সত্য। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখি। পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী, বন উপবন, উপত্যকা অধিত্যকা, সমতলভূমি মালভূমি, মরুভূমি, আবার হ্রদ প্রস্রবণ—মায়ের আমাদের নাই কি? পর্ব্বত শ্রেষ্ঠ হিমালয় মায়ের মস্তকে চুল হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে—তাহার গগনভেদী তুষার শুভ্র-চূড়া মায়ের মাথায় হীরককীরিটের ন্যায় জ্বলিতেছে। নদী শ্রেষ্ঠ গঙ্গা মায়ের বুকে প্রবাহিত হইয়া তাহার দুই কূলের সমতলভূমির সন্তানগণকে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছে।

আহা! গঙ্গার মত নদী আর কোথায় আছে? গঙ্গার জলের কি আশ্চর্য্য গুণ! গঙ্গাজল তুলিয়া ঘরে রাখিয়া দাও—কতকাল থাকিবে—তবুও জলে পোকা হইবে না। সংক্রামক রোগের বীজাণু গঙ্গাজলে ফেলিয়া দাও—ছয় ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া যাইবে। এরূপ জল পৃথিবীতে আর কোথাও

পাওয়া যায় না—জলের এমন গুণ, এমন শক্তি আর কোথাও দেখা যায় না। এইরূপ আরও কত পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী, মায়ের শরীরের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

আবার দেখ এমন ষড়-ঋতু-সম্পন্না, এমন শোভাময়ী, "ধন-ধান্য-পুষ্পেভরা" বসুন্ধরা আর কোথায় আছে? এখানে ফল ফুল, গাছপালা, পশুপক্ষী, সমস্তই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মায়—সমস্তই সজীব। সমস্ত প্রকৃতিই যেন হাস্যময়ী, তেজোময়ী, বলদৃপ্তা।

সূর্য্যই প্রকৃতির জীবন—আলো এবং উত্তাপই প্রকৃতিকে রক্ষা করে। শীতপ্রধান দেশে—যেখানে সূর্য্যকিরণ বেশ ভাল করিয়া পাওয়া যায় না—প্রকৃতি সজীব নয়। শীতের চোটে ফল ফুল, গাছপালা, ভাল করিয়া জন্মিতে পারে না, পশুপক্ষী বাড়িতে পারে না, মানুষ কুঞ্চিত হইয়া যায়—তাহার শরীরের সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় না। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। রাজপুত, মধ্যএশিয়াবাসী, তাতার, আরববাসী, শিখ—ইহারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বলিয়া খ্যাত—ইহারা সকলেই উষ্ণপ্রধান দেশের লোক।

আচ্ছা, বল দেখি, আমাদের দেশে সমস্ত প্রকৃতিই সজীব, তবে মানুষকে এখন নির্জ্জীব দেখি কেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি বর্ত্তমান আমাদের দেশের লোক দুর্ব্বল, উদ্যমহীন এবং রুগ্ন হইয়া যাইতেছে। মানুষ কি তবে প্রকৃতির বাহিরে কোন সৃষ্টি ছাড়া জীব? তা'তো নয়। সমস্ত প্রকৃতি যে

নিয়মের অধীন মানবসমাজও সেই নিয়মেরই অধীন। এই দেশের মানুষ—এই উষ্ণপ্রধান দেশের মানুষ—আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ অসাধারণ যোদ্ধা, অদ্বিতীয় বীর, জগদ্বিখ্যাত মনস্বী ও জ্ঞানী, এবং অমানুষকর্ম্মা বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

আচ্ছা, আমাদের তবে এহেন হীনাবস্থা কেন? কেন?—তাহা শুনিবে? নৈতিক অবনতি এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতা আমাদের হীনাবস্থার কারণ। নৈতিক অবনতির জন্য নানারূপ উৎকট দোষ আমাদের সমাজদেহে প্রবেশ করিয়া জীবনহর বিষের ন্যায় ইহাকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাভাবে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে না, বহুতর গ্রামে দূষিত পানীয় জল ব্যবহার করিতেছে, এবং স্বাস্থ্যপ্রদ উপযুক্ত স্থান এবং আবাসে বাস করিতে পারিতেছে না—এইরূপে দেশের অধিকাংশ লোকই যেন তেন প্রকারেণ পেটের জ্বালা চাপা দিয়া, মাথা গুঁজিয়া, কোনরূপে ক্রমশঃ ক্ষয়িতাবশেষ, প্রায় নিঃশেষিত-বল-বীর্য্য মেরুদণ্ডহীন শরীরটাকে খাড়া রাখিয়াছে। দুর্ব্বলকে সকলেই ঠাসিয়া ধরে—রোগই বা ছাড়িবে কেন? ম্যালেরিয়ার নিষ্পেষণে, মহামারীর উৎসাদনে এবং তদুপরি করাল দুর্ভিক্ষের আক্রমণে বর্ষে বর্ষে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, দেশ হইতে দেশান্তর ছারখার হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা হতাশ হইব? কখনই না। আমাদের নিজের দোষেই আমরা এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি।

যদি দোষমুক্ত হইতে পারি—এবং তাহা আমাদেরই হাতে—তবেই আবার উন্নত হইতে পারিব, আবার আমরা মায়ের উপযুক্তসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব। আমরা নৈতিক-বলে বলীয়ান্ হইয়া আমাদের সমাজ হইতে দুর্নীতিকে পদাঘাতে তাড়াইয়া দিব, আবার আমরা অর্থোপার্জ্জন করিতে শিখিব, আবার আমরা প্রকৃত শিক্ষার গুণে পূর্ব্বের ন্যায় উন্নত হইব।

ধর্ম্ম এবং সভ্যতার দিক দিয়া দেখিলেও আমরা ঐরূপই দেখিতে পাইব। যখন অন্যান্য-দেশীয়-লোকেরা—যাহারা আধুনিক জগতে সভ্য এবং উন্নত বলিয়া খ্যাত—বন্যজন্তুর ন্যায় বনে জঙ্গলে বাস করিত, উলঙ্গ অথবা অর্দ্ধোলঙ্গ অবস্থায় থাকিত, কাড়াকাড়ি মারামারি করিয়া কাঁচামাংস ছিঁড়িয়া খাইত, তখন—তখন কেন তাঁহার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে ভাবতবর্ষে সভ্যতার উন্মেষ এবং চরম পরিণতি হইয়াছিল। ভারতবর্ষই সর্ব্বপ্রথম ঈশ্বরের সিংহাসনতল হইতে তাঁহারই আদেশে, তাঁহারই সনদ প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান-ধর্ম্ম-পুণ্য-কাহিনী সংবাদ জগতে আনয়ন ও প্রচার করিয়াছিল। আজ আবার জগতে ধর্ম্ম এবং সভ্যতার বিপ্লব উপস্থিত—কে তাহার মীমাংসা করিবে? কে আর করিবে? বিপ্লবের দিনে আজ আবার জগদ্গুরু ভারতের ডাক পড়িয়াছে। ভারতই তাহার মীমাংসা করিবে। এ সমস্যা মিটাইবার শক্তি ও উপকরণ আর কাহারও নাই। ভারতবর্ষই সমস্ত সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, ভারতেই সমস্ত সভ্যতার সাগর সঙ্গম হইয়াছে।

আর্য্যসভ্যতা, গ্রীকসিথীয় হূণ-সভ্যতা, পারসীক ও ইস-লামী সভ্যতা এবং সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান ইউরোপীয় খৃষ্টান-সভ্যতা —সমস্তই ভারতে একত্রিত হইয়াছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বো-দার-আর্য্যসভ্যতা-প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য সভ্যতা হইতে উপ-যোগী-সদুপকরণ-সংগ্রাহক এক মহামহিমময় মহৈশ্বর্য্যশালী বিরাট ভারতীয় জাতির সৃষ্টি সূত্রপাত হইয়াছে। ধন্য আমরা এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি! ধন্য আমরা ভবিষ্যতের একটী অত্যুজ্জ্বল চিত্রের আভাস পাইয়াছি!!

আর্য্যদর্শন ও সমাজ।

ষড়্‌দর্শন আর্য্যগণের অদ্ভুত সৃষ্টি। এই বিদ্যা অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছে। যথাযথরূপে দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষা দিতে পারেন এরূপ ঋষিকল্প ব্যক্তি আজকাল দেখা যায় না। তবে আংশিক ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন এরূপ দুই এক জন ব্যক্তি কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। দর্শন পাঠে আর্য্যগণের অসাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর গবে-ষণামূলক নানাবিধ সত্যের আবিষ্কার প্রভৃতির আভাস পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। যোগশাস্ত্রে যে সমস্ত অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা অধুনা যাহা অত্যন্ত আংশিকভাবে বুঝিতে সক্ষম তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যগণ বিজ্ঞানে যতদূর উন্নত

হইয়াছিলেন, প্রকৃতিকে যেরূপভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন তাহার সহিত পাশ্চাত্যজ্ঞানবিজ্ঞানের তুলনাই হইতে পারেনা।

"আমাদের দেশে পুরাতন বিদ্যা সকল লুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বপুরুষদিগের কথা আমরা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিই। অথচ যে বিদ্যার ভগ্নাংশ মাত্র আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে, ধর্ম্মে, শাস্ত্রে, শিক্ষায় আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, তাহার তুলনায় আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের সমস্ত বিদ্যা নবজাত শিশুর অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

যেমন, শিশু যত পদার্থ সম্মুখে দেখে তাহা হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বাহ্যজগতের কত জ্ঞান সঞ্চয় করে, কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্বরূপ ও সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না, সেইরূপ পাশ্চাত্যবিজ্ঞান প্রকৃতির স্থূল-পদার্থ সকল হাতে তুলিয়া হাত বুলাইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কতক জ্ঞান সঞ্চয় করে, কিন্তু জগৎ কি, পদার্থের আসল স্বরূপ কি, স্থূল সূক্ষ্মের সম্বন্ধ কি, তাহা কিছুই জানে না এবং এই বিদ্যার অভাবে পদার্থের প্রকৃতস্বভাব অবগত হইতে পারে না। মনুষ্য সম্বন্ধে শবচ্ছেদ করিয়া ও রোগের লক্ষণ ও অবান্তর কারণ নিরীক্ষণ করিয়া যতটুকু জ্ঞান সঞ্চয় হয় ততটুকু জ্ঞান পাশ্চাত্য বিদ্যায় পাওয়া যায়!

এই জ্ঞান অনেক বিষয়ে ভ্রান্ত। বৈজ্ঞানিক বলেন আকর্ষণশক্তি জগতের সর্ব্বব্যাপী ও অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু মনুষ্য প্রাণায়াম দ্বারা আকর্ষণশক্তি জয় করিতে পারে এবং স্থূল

জগতের বাহিরে সেই নিয়মের কোন জোর নাই। বৈজ্ঞানিক বলেন হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাস নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইলে প্রাণ শরীরে থাকিতে পারে না, কিন্তু প্রমাণিত হইয়াছে যে হৃদ্‌-পিণ্ডের স্পন্দন ও শ্বাস নিঃশ্বাসের ক্রিয়া অনেকক্ষণ ও অনেক দিন পর্য্যন্ত রুদ্ধ হইতে পারে অথচ সেই রুদ্ধনিঃশ্বাসব্যক্তি পূর্ব্ববৎ নড়িতে পারে ও কথা বলিতে পারে, বাঁচা ত দূরের কথা।

ইহাতে বুঝা যায় যে পাশ্চাত্য বিদ্যা স্বক্ষেত্রেও স্থূল-পদার্থ জ্ঞানেও কত সঙ্কীর্ণ ও লঘু। আসল বিজ্ঞান আমাদেরই ছিল। সেই জ্ঞান স্থূলপ্রয়োগ দ্বারা লব্ধ না হইয়া সূক্ষ্ম-প্রয়োগ দ্বারা লব্ধ হইয়াছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়াছে বটে, কিন্তু যে উপায় দ্বারা লব্ধ হইয়া-ছিল, সেই উপায়ের দ্বারা পুনর্লব্ধও হইতে পারে। সেই উপায় যোগ!" *

দর্শনশাস্ত্র পাঠে আর্য্যদিগের গভীরজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা যেরূপ আভাস পাই অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থাদি হইতেও আমরা সেইরূপ আর্য্যদিগের নানা বিষয়িণী প্রতিভা, সমাজ গঠন ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে অদ্ভুত কৌশল ও বহুদর্শিতা এবং সর্ব্বোপরি তাহাদিগের অত্যুচ্চ সামাজিক আদর্শ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যাই।

অবশ্য পরবর্ত্তী কালে আর্য্যগণ তাঁহাদিগের প্রাচীন-আদর্শচ্যুত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সার্ব্বভৌম ও

---

* "ধর্ম্ম" পত্রিকা।

উদার ধর্ম্মের মূল সত্য হারাইয়া ফেলিয়া বহিরাবরণ লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং এই আদর্শচ্যুতি ও ধর্ম্মচ্যুতিই তাঁহাদিগের পতনের কারণ হইয়াছিল।

তাঁহারা পরবর্ত্তী কালে প্রকৃত ধর্ম্ম এবং তাহার চরম লক্ষ্যে পঁহুছিবার যে সমস্ত বহুতর এবং কালধর্ম্মোপযোগী পথ প্রদর্শিত হইয়াছিল, সেইগুলিকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে গোল বাধাইয়া, উপায়কে উদ্দেশ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ভারতের অধঃপতনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে উদ্দেশ্য স্থির থাকিলেও, উদ্দেশ্য এক হইলেও, উপায় কখন স্থির থাকিতে পারে না, উহা সময় সাপেক্ষ এবং সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে, উহার পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী।

আর্য্যগণ তাঁহাদিগের ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন, উহা তাঁহাদিগের মতে অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয়। কিন্তু তাঁহারা ঐ ধর্ম্ম লাভ করিবার উপায়গুলিকে সনাতন, অপৌরুষেয় এবং অভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বেদ আর্য্যগণের মূল এবং সনাতন ধর্ম্ম গ্রন্থ কিন্তু স্মৃতি তাহা নহে। স্মৃতি ঐ ধর্ম্ম লাভের সাহায্যক উপায় মাত্র, যাহাতে ঐ ধর্ম্ম সমাজে প্রতিষ্ঠিত থাকে সেই জন্য সমাজকে ঐধর্ম্ম লাভের উপযোগী করিয়া তুলিবার নিমিত্ত কাল এবং অবস্থানুসারে কতকগুলি নিয়ম ও শাসন মাত্র।

কালভেদে এবং অবস্থাভেদে স্মৃতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে

এবং প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দুসমাজে তাহাই হইয়াছে। মন্বাদি প্রণীত প্রাচীন স্মৃতির অনুশাসন হিন্দুসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছিল এবং তৎপরিবর্ত্তে রঘুনন্দন প্রভৃতির নব্য স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও হিন্দুসমাজ বহুতর বিষয়ে নব্য স্মৃতির অনুশাসন মানিয়া চলিতেছেন। হিন্দুসমাজ পতনোন্মুখ বলিয়া ঐ স্মৃতি যদিও বর্ত্তমানে সমস্ত বিষয়ে অবস্থা এবং সময়োপযোগী নয় তথাপি উহা সংস্কৃত হয় নাই।

ইহার কারণ হিন্দুদিগের সাধারণ অবনতি এবং সমস্ত হিন্দুসমাজকে পুরাতনের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন ভাবে গঠন করিবার উপযোগী প্রবল শক্তিসম্পন্ন পুরুষের অনাবির্ভাব। যাহা হউক সমস্ত হিন্দুজাতির নব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই ঐরূপ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং কার্য্যতঃ ও তাঁহারা কাল ও সময়োপযোগী ব্যবস্থার মধ্য দিয়া হিন্দুধর্ম্মের সনাতন আদর্শ এবং ধর্ম্মকে লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ইতি মধ্যে বৈদেশিক এবং বিজাতীয় ভাবাপন্ন কতকগুলি ব্যক্তি এবং দল উত্থিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের যাহা কিছু সমস্তই কুসংস্কার এবং অসত্য প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু বলা বাহুল্য তাঁহাদিগের ভ্রান্ত চেষ্টা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহারা সমাজের বিশেষ কোন প্রকার মঙ্গল সাধন করিতে পারেন নাই।

ঋগ্বেদ সংহিতায় নির্দ্দেশ আছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ

হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অন্যান্য বর্ণ ক্রমশঃ নিকৃষ্ট।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সমাজ চারিটী শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। জ্ঞানালোচনা এবং মস্তিষ্কের কার্য্য করেন বলিয়া ব্রাহ্মণ মুখ হইতে, সমাজকে বাহুবল দ্বারা রক্ষা করেন বলিয়া ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করেন বলিয়া বৈশ্য উরু হইতে এবং সমাজে নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবিদিগের কার্য্য করেন বলিয়া শূদ্র চরণ হইতে উৎপন্ন এইরূপ কথিত হইয়াছে। সমস্ত সমাজকে একটী দেহের সঙ্গে উপমা দেওয়া হইয়াছে এবং সেই দেহ স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার দেহ সুতরাং অতিশয় ভক্তির আধার। সমাজের উপকার করিলে সমাজকে সেবা করিলে স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে সেবা করা হয়। যেমন প্রত্যেক অঙ্গের পুষ্টি এবং পরিণতিতে দেহের পুষ্টি ও পরিণতি সেইরূপ সমাজান্তর্গত প্রত্যেক বর্ণের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি, যেমন দেহের পক্ষে চারিটী অঙ্গই বিশেষ দরকারী, কোনটীকেও বাদ দেওয়া অথবা অবহেলা করা চলে না, সেইরূপ সমাজদেহেরও উক্ত চারিটী অঙ্গই বিশেষ প্রয়োজনীয়, উহার কোনটীকেও বাদ দেওয়া অথবা অবহেলা করা চলে না—এই বিশ্বাস আর্য্যসমাজের মূল ভিত্তি স্বরূপ ছিল।

তাঁহাদের গুণ এবং কর্ম্মগত এই শ্রেণীবিভাগ ক্রমশঃ

বংশগত হইয়া দাঁড়াইল এবং বর্ত্তমানে উহা অতি জঘন্য অবস্থায় সমাজে বিরাজ করিতেছে।

এই চারিবর্ণের উচ্চ তিন বর্ণকে আর্য্যগণ দ্বিজ নামে অভিহিত করিতেন। দ্বিজ এই শব্দের অর্থ, যিনি দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উপনীত হইয়া শক্তি এবং জ্ঞান সঞ্চয় করিবার জন্য যেদিন তাঁহারা প্রস্তুত হইতেন সেই দিন তাঁহারা দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ করিতেন এইরূপ মনে করা হইত। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহাদিগের শারীর জন্ম অথবা পশু জন্ম হইত। কিন্তু যেদিন তাঁহারা উপনীত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য গুরুগৃহে গমন করিতেন সেইদিন তাঁহাদের প্রকৃত মনুষ্য জন্ম হইত।

অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আর্য্য বালকগণ গুরুগৃহে গমন করিতেন এবং তথায় কঠোর সংযম, কষ্টসহিষ্ণুতা, বিদ্যাভ্যাস, গুরুসেবা প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। আবার কেহ কেহ চিরজীবন অবিবাহিত থাকিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে ও সমাজ সেবায় জীবন যাপন করিতেন। ছাত্রগণ গুরুগৃহেই অবস্থান করিতেন এবং শিক্ষা সমাপ্ত না হইলে গৃহে ফিরিতেন না।

গৃহে থাকিলে বিদ্যালাভের ব্যাঘাত জন্মে, পুরুষোচিত কঠোরতা শিক্ষা করা হয় না এবং নানা রকমের নানা শ্রেণীর অসৎ লোকের সংসর্গে চরিত্র হানির সম্ভাবনা থাকে এইজন্য শিক্ষাকালে শিক্ষার্থীগণ কোলাহলহীন পবিত্র শান্তিময় তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। পিতা অথবা তৎস্থানীয়

কাহাকেও শিক্ষার্থিগণের শিক্ষাকালীন খাওয়া পরা অথবা অন্য কোন প্রকার ব্যয়ভার বহন করিতে হইত না। সমস্ত সমাজ সেই খরচ যোগাইতেন। শূদ্রদিগের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ছিলনা, কেননা অতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবিদিগের পক্ষে গুরুগৃহে গিয়া বহুকাল থাকিয়া শিক্ষালাভ করার অবকাশ ঘটিয়া উঠে না। এইরূপে প্রায় সমস্ত আর্য্যজাতি আদর্শ শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ এবং অবকাশ পাইতেন। কিন্তু হায়! আজকাল অর্থাভাবে সহস্র সহস্র বালক ও যুবক শিক্ষা-লাভ করিতে পারিতেছে না——চিরকাল অজ্ঞান, ও অসমর্থ হইয়া জীবনযাপন করিতেছে। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহাদিগের মধ্য হইতে হয়ত কত মহৎ লোক উত্থিত হইত কে তাহার সংখ্যা করিবে? আবার আজকাল যাহারা শিক্ষা-লাভ করিবার অবসর এবং সুবিধা পাইতেছে তাহাদের অধিকাংশই চরিত্রহীন ও শক্তিসামর্থ্যহীন হইয়া কেবল লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই আপনাদিগকে কৃতবিদ্য মনে করিতেছে।

কোন্ কোন্ বর্ণ কোন আশ্রমের অধিকারী তাহা বামন-পুরাণে বিশেষরূপে লিখিত আছে। সাধারণের অবগতির জন্য তাহার কয়েক পংক্তি এইস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

চত্বার আশ্রমাশ্চৈব ব্রাহ্মণস্য প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যং বানপ্রস্থঞ্চ ভিক্ষুকম্॥
ক্ষত্রিয়স্যাপি কথিতা আশ্রমাস্ত্রয় এবহি।

ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ গার্হস্থ্যমাশ্রমদ্বিতয়ং বিশঃ ॥
গার্হস্থ্যমুচিতস্ত্বেকং শূদ্রস্য ক্ষণমাচরেৎ ॥

অর্থাৎ ভৈক্ষ্য ব্যতীত অপর তিনটীতে ক্ষত্রিয়ের অধিকার দেখা যায়। বৈশ্যের পক্ষে শেষ দুই আশ্রম নাই। শূদ্রজাতি একমাত্র গার্হস্থ্যাশ্রম দ্বারাই অন্য তিন আশ্রমের ফলাধিকারী হয়েন। ব্রাহ্মণের চারি আশ্রমেরই অনুষ্ঠানের নিত্যত্ব ও অবশ্যকরণীয়তা দৃষ্ট হয়।

গার্হস্থ্যাশ্রম আর্য্যমাত্রেরই ছিল। এই আশ্রমে কর্ত্তব্য অর্থোপার্জ্জন, ধর্ম্মার্থ ও সমাজরক্ষার্থ পরিবার প্রতিপালন, ধর্ম্ম, দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং অতিথি সেবা। আর্য্যগণ ধর্ম্মার্থ বিবাহ করিতেন, আর্য্যপত্নী স্বামীকে ধর্ম্মপথে তাঁহার সঙ্গিনী হইয়া সহায়তা করিবেন এইজন্য তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী বলা হইত। প্রত্যেক আর্য্য গৃহস্থকেই সমস্ত সমাজের হিত চেষ্টা করিতে হইত; গৃহস্থগণের পক্ষে এই অনুশাসন ছিল যে, তাঁহারা যে অর্থোপার্জ্জন করিবেন তদর্দ্ধ নিজ পরিবার প্রতিপালনে ব্যয় করিবেন, এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিবেন এবং অবশিষ্ট চতুর্থাংশ দান করিয়া সমাজসেবায় ব্যয় করিবেন।

ইহার পর বাণপ্রস্থাশ্রম। এই আশ্রম কেবল ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের ছিল। এই আশ্রমে গৃহস্থ নিজ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে বৃহত্তর সমাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করিবেন। এই সময় বয়োবৃদ্ধি-হেতু বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, বহুদর্শিতা জন্মে, চিত্ত অনেক স্থির হইয়া আসে

এবং সাধারণের পক্ষে ভোগদ্বারা ত্যাগ করিবার শক্তি জন্মে। এই আশ্রমবাসীর কর্ত্তব্য কেবল সমাজহিতচিন্তা। তিনি সমস্ত শক্তি দিয়া সমাজের উন্নতিবিধানে প্রয়াসী হইবেন।

তৎপর ভৈক্ষ্যাশ্রম। ভিক্ষু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবেন না; তিনি আপন সত্তা বিশ্বসত্তায় মিশাইয়া দিবেন, আপনাকে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে উপলব্ধি করিবেন। তিনি নির্দ্বন্দ্ব, তাঁহার আপন পর, নিজদেশ পরদেশ জ্ঞান থাকিবে না। তিনি মুক্তিপন্থী, কেবলমাত্র ভগবানকে পাইবার চেষ্টা করিবেন। অজর, অমর, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত জ্ঞানময়, অনন্ত প্রেমময়, ও অনন্ত শক্তিময় আত্মাকে উপলব্ধি করাই তাঁহার কাজ।

রামায়ণের শিক্ষা।

কতকাল হইল এই মহাগ্রন্থ ভারতে পূজিত ও পঠিত হইতেছে, শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে কত লোককে ইহা ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত জনসমাজ মহর্ষিগীত, কাব্যেতিহাসপুরাণসমন্বয়, অলৌকিকধ্যানবলা-বিষ্কৃত, নিত্য-সত্য-প্রতিষ্ঠিত এই মহান্ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া সঞ্জীবিত থাকিবে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

রামচন্দ্রের শিরীষকোমল বজ্রকঠিন, উদার বিশাল দয়াল

হৃদয়, তাঁহার মহাসাগরবৎ “অধিগম্য” অথচ “অধৃষ্য” চরিত্র, তাঁহার প্রজারঞ্জন, ন্যায়পরতা, সত্যবাদিতা, ভ্রাতৃস্নেহ, পত্নী-প্রেম, মিত্রতা, আশ্রিতে দয়া এবং স্বজনবাৎসল্য প্রভৃতি অশেষ গুণাবলি সাগর কল্লোলের ন্যায় আমাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে—সে অতলস্পর্শ চরিত্র মাপিতে গিয়া আমরা দিশেহারা হইয়া যাই! মহাবীর লক্ষ্মণের কঠোর ব্রহ্মচর্য্য এবং তজ্জনিত মহাশক্তি সংগ্রহ তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি ও সম্পূর্ণ আত্মদান, গুহকের মৈত্রী, হনুমানের প্রভুভক্তি এবং সর্ব্বোপরি সীতার পতিপ্রেম ও পতিভক্তি, প্রতি পাঠকের হৃদয়ে রেখাপাত করিয়া যায়।

অন্যদিকে উৎসাহোদ্যমমত্ত, ত্রিভুবন বিজয়ী, রজঃশক্তির অবতার, দর্পী, যোগী এবং ভোগী, কঠোর তাপস ও দুষ্কৃত-কারী রাবণের আসুরিক চরিত্র এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎকনিষ্ঠ বিভীষণের ধর্ম্মপরায়ণতা ও বিশ্বধর্ম্মের জন্য কুলধর্ম্মত্যাগ এবং রামায়ণকথিত অন্যান্য আসুরিক চরিত্র ও আমাদিগকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিয়া ফেলে।

কিন্তু সমগ্র রামায়ণ যে মূলতথ্যকে কেন্দ্র করিয়া, যে মহতী শিক্ষাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, শাখাপল্লবাচ্ছন্ন হইয়া আমরা তাহা দেখিতে পাইনা। সে মূলতথ্য কি? “যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ”। অমিতপরাক্রম, ত্রিভুবনবিজয়ী, দেবগণভীতি, মহৈশ্বর্য্যশালী রাবণ, সুবর্ণ লঙ্কায় স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া অঙ্গুলীহেলনে ত্রিভুবন শাসিত করিবে—কে তাহাকে বাধা দেয়? বিজ্ঞানবলে সূর্য-চন্দ্র-অগ্নি-বায়ু-শক্তি

যে দাসবৎ খাটাইতেছে, যাহার দাপটে পৃথিবী কম্পমানা কে তাহার ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করে? যাহা রাবণের ইচ্ছা তাহাই জগতের আইন—তাহাই জগৎকে অবনতমস্তকে মানিতে হইবে—ইহাই রাবণের ও জগৎবাসী সকলের স্থির বিশ্বাস।

রাবণের দর্প খর্ব্ব হইবে, রাবণের শক্তি নষ্ট হইবে, ইহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে না। তাই ত! কে রাবণকে বাধা দেয়? কে তাহার যথেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়? কৈ কাহাকেও ত তাহার সমপরাক্রম দেখা যায় না! রাবণও ইহাই ভাবিয়াছিল।

কিন্তু সমগ্র বিশ্বে এক অদৃশ্য মহাশক্তির লীলা চলিতেছে —সমগ্র বিশ্ব যে শক্তিকে মানিয়া চলিতেছে, উন্মত্ত উদ্ধত রাবণ তাহাকেও অবমাননা করিল—রাবণ ধর্ম্মকে হনন করিল।

কি হইল! একি? জগদ্‌বিখ্যাত রাবণরাজা তাঁহার রাজপাট ও স্বর্ণলঙ্কা সহিত কোথায় ফুৎকারে উড়িয়া গেল! হায় হায়! রাবণ যে নিজেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। সে যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—কে তাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিবে? ছি ছি! সামান্য নর ও বানরে এত শীঘ্র এমনি করিয়া সাগণনবংশধরগণ স্বুবর্ণ লঙ্কা ছারখার করিয়া দিল! কোন্ মহাশক্তিকে আশ্রয় করিয়া তাহারা এরূপ অসাধ্য সাধন করিল—রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিল?

রামায়ণ উত্তর করিতেছেন—"ধর্ম্ম"। ধর্ম্মকে অবহেলা

করিয়া রক্ষোরাজ সবংশে ধ্বংস হইল, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সামান্য নর হইয়া শ্রীরামচন্দ্র অশিক্ষিত বর্ব্বর বানরকে বশীভূত করিলেন, তাহারা তাঁহার মুখের কথা শুনিয়া পাগল হইয়া অসাধ্য সাধনে ছুটিল। মানব হইয়া শ্রীরামচন্দ্র জগত্রাস রাবণকে জয় করিলেন। ধর্ম্মকে আশ্রয় কর, অধর্ম্মকে ত্যাগ কর—ইহাই রামায়ণের মূল শিক্ষা।

আর্য্যদিগের আদর্শ।

স্বাধীনতাতেই জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়—স্বাধীনতাতেই উন্নতি। পবিত্র নির্ম্মলবাতাস কেমন স্বাধীন!—উহাকে আবদ্ধ কর, দূষিত হইয়া যাইবে। স্রোতস্বতীর জল কেমন স্বচ্ছ!—উহার গতি রোধ কর, পচিয়া দুর্গন্ধ হইবে। বনের পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ কর, উহা আর তেমন আনন্দে ডাকিবে না। জড়জগতই যখন আপন মনে বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে ভালবাসে তখন মানুষ ত ভালবাসিবেই।

যাহারা যত স্বাধীন, তাহারা ততই উন্নতিশীল। মনুষ্যেতর প্রাণী জড় অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা উপলব্ধি করে, কাজেই জড়পদার্থ অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী। মানুষ পশুপক্ষী অপেক্ষা স্বাধীনভাব আরও বেশী উপলব্ধি করে, কাজেই আরও উচ্চস্তরে। আবার মানবসমাজমধ্যে যে সমাজ যত অধিক পরিমাণে স্বাধীনতাপ্রয়াসী তাহারা ততই উন্নতিশীল।

"কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে এমন অনেক বন্য এবং পার্ব্বত্য জাতি আছে যাহারা যদিও স্বাধীন তথাপি অত্যন্ত অবনতাবস্থায় জীবন যাপন করে। এই স্থানেই বুঝিয়া রাখা উচিত যে স্বাধীনতা বলিলে কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা বুঝায় না।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বাধীনতার অংশবিশেষ, উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নহে। বর্ব্বর এবং অসভ্য জাতি যখন রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করে, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে হয়ত তাহারা কোন দুর্গম প্রদেশে বাস করে, অথবা তাহাদের দেশ অনুর্ব্বর। ঐ সমস্ত জাতি যদিও কোন বৈদেশিক রাজার এবং হয়ত কোন স্বদেশীয় রাজারও অধীন নহে, তথাপি উহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা কখনও স্বাধীন ভাবাপন্ন নহে।

অনেকস্থানে উহাদের সামাজিক শৃঙ্খলা এতই কঠোর যে উহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার বিরোধী এবং ঐ সকল জাতি এরূপ অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত যে সর্ব্বদা সশঙ্কচিত্তে বাস করে। বৃক্ষপত্রের মর্ম্মরে, মেঘের গর্জ্জনে, পেচকের শব্দে, উহারা হয়ত ভয়ের অবতারণা করে। উহারা প্রকৃতির ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত, সদাই আরষ্ট। পিশাচ, দৈত্য এবং নানাপ্রকার অঘটন-ঘটক অপদেবতা যেন সদাই উহাদের পশ্চাদ্ধাধন করিতেছে। উহারা প্রকৃতির উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতে পারে নাই, সদা সর্ব্বদা প্রকৃতির দাস, কাজেই উহারা অত অবনত।

আজকাল পৃথিবীতে যত উন্নতিশীল জাতি আছে, তাহাদের

স্বাধীনতাস্পৃহা অবশ্যই খুব বেশী। তাহারা ধর্ম্ম, রাজনীতি এবং সমাজের মধ্য দিয়া উত্তরোত্তর স্বাধীনতার বিকাশ করিতেছে এবং প্রকৃতিকেও অনেক সময় নিজ অধীনে আনিতেছে।

কিন্তু, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা যে কি বস্তু, তাহাতে যে কত আনন্দ তাহা আধুনিক জাতিগুলি এখনও ধরিতে পারে নাই। আমেরিকার ক্রোড়পতি বণিক তাহার টাকার বস্তার উপর বসিয়াও মনের শান্তি পাইতেছে না; সেই জন্যই এত করিয়াও তাহারা দেখিতেছে যে তাহারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নয়। তাহারা তাহাদের মনের অধীন, সুখদুঃখের অধীন, নিজ নিজ প্রকৃতির অধীন। তাহারা যথাসাধ্য করিয়াও দেখিতেছে যে দুঃখভার ছায়ার ন্যায় তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছে। সংসারে কিছুতেই শান্তি পাইতেছেনা—সংসারের সুখ তাহাদের নিকট মরীচিকার ন্যায় বোধ হইতেছে।

সম্পূর্ণ স্বাধীনতার গান এই ভারতবর্ষেই গীত হইয়াছিল। ভারতই জানিয়াছিল কি করিয়া কর্ম্মযোগী জীবন্মুক্ত হইতে পারে, কি করিয়া জ্ঞানী এবং ভক্ত সমাধিতে মুক্ত হইতে পারে, কি করিয়া রাজযোগী সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার অধীন করিতে পারে!

আজ সমস্ত জগৎ দুঃখভারাক্রান্ত হইয়া, অশান্তিতে জ্বলিয়া হতাশ হইয়া, ভারতকে মুক্তির বাণী শুনাইবার জন্য ডাকিতেছে—ভারত কি সে ডাক শুনিবে না?—ভারত কি তাহার লুপ্তস্থানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতের গুরুরূপে বৃত হইবে না?

গীতা।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরপ্রাঙ্গনে পাণ্ডব ও কৌরবগণ ভাবী সমরের জন্য সশস্ত্র এবং সসজ্জ, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই আসন্ন-যুদ্ধদানের অপেক্ষায় রহিয়াছে। রণক্ষেত্র প্রলয়োদ্গারি-ঝটিকাসূচক মহাসাগরের স্তব্ধ ভীষণ প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। এমন সময় পাণ্ডবদিগের আশা ভরসা রথিশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়া অস্ত্রত্যাগ করতঃ রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

যুদ্ধে বহুলোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী, উভয়পক্ষীয় অগণন যোদ্ধৃবর্গ হতাহত হইবে। পরমপূজ্য চিরস্নেহপরায়ণ পিতামহ ভীষ্ম, পিতৃতুল্য গুরু দ্রোণাচার্য্য, মাতুল শল্য এবং কৌরব-পক্ষীয় অপরাপর স্বজন ও জ্ঞাতিবর্গ, অপরদিকে স্বপক্ষীয় আত্মীয় স্বজন প্রভৃতির শব স্তূপোপরি ভাবী সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এই চিন্তায় কঠোরকর্ম্মা, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দারুণ মর্ম্মপীড়া পাইতে লাগিলেন।

"যুদ্ধ হইতে বিরত হইব" ইহাই তিনি স্থির করিয়া বসিলেন। "এরূপে রাজ্যলাভ করিয়া কি হইবে?—কৌরব ও পাণ্ডবপুরী একটী মহাশ্মশানে পরিণত করিয়া রাজ্যভোগে কি সুখ?—বরং ইহাতে অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা"—এইরূপ নানা তামসিক চিন্তা, মোহাচ্ছন্ন পার্থের নিকট সাত্ত্বিক ভাবের

আবরণে উপস্থিত হইল—তাঁহার নিকট ধর্ম্মনাশক দৌর্ব্বল্য-খ্যাপক মায়া, দয়া বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল। এমত সময়ে, এইরূপ পাত্রের নিকট শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ অবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রমুখাৎ ধর্ম্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তাহা লাভ করিবার নানারূপ বিভিন্ন পন্থা প্রদর্শনকালে যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ-বাণী গীত হইয়াছিল—তাহাই গীতা নামে অভিহিত।

গীতাকে আশ্রয় করিয়া যে মহান্ সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে তাহা কোন কালের কোন দেশবিশেষের অথবা জাতিবিশেষের ধর্ম্ম নহে—জগতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে তৎসমস্তেরই সামঞ্জস্য এবং সমন্বয়বিধান এক গীতাতেই হইয়াছে! জগতে কোন ধর্ম্মই দৈনন্দিন জীবনে সমাজের যে সমস্ত অবশ্যকরণীয় কার্য্য আছে তাহার সহিত ধর্ম্মের ঐক্য বিধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু গীতা যে উদার ধর্ম্ম প্রচলন করিয়াছেন, তাহাতে এক দিকে যেরূপ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর মুক্তিপথ প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্রূপ অন্য দিকে সংসারের সহস্রবন্ধনকে মানিয়া লইয়াও, সমাজের যত প্রকার কার্য্য আছে তৎসমুদয়ের কোনটী হইতেও ভীত হইয়া সরিয়া না যাইয়াও, কিরূপে কর্ম্মী সংসারী সহস্রবন্ধনেও বন্ধনহীন হইয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

মধ্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি মধ্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমোভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্॥

গীতা—দ্বাদশ অধ্যায়।

এই স্থানে ভগবান অর্জ্জুনকে প্রথমতঃ তাঁহাতে মন স্থির করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং অশক্তপক্ষে ঐরূপ ভাবে মনঃস্থির অন্ততঃ অভ্যাস করিতে বলিতেছেন; তাহাতেও অশক্ত হইলে ভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতে উপদেশ করিয়াছেন এবং ইহাতেও যদি অর্জ্জুন অপারগ হন, তাহা হইলে সর্ব্ব-শেষে এই ব্যবস্থা করিলেন যে তিনি যেন সমস্ত কর্ম্মই ফলা-কাঙ্ক্ষাহীন হইয়া যন্ত্রবৎ করিয়া যান।

শেষের যে ব্যবস্থা ইহা সমস্ত ব্যবস্থাগুলির মধ্যে তুলনায় সহজ হইলেও প্রকৃষ্ট, কেননা উহা আমাদিগকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবার আশ্বাস দেয়। বিচারে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাতে আমাদের কি আসে যায়? আমরা যাহা অনুসরণ করিয়া সফলতা লাভ করিতে পারিব তাহাই আমাদের উপ-কারী এবং তাহাই আমাদের নিকট সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই জন্যই

ভগবানও বলিতেছেন যে অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান হইতে কর্ম্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ —কেননা ত্যাগ হইতেই শান্তি আসে।

ভগবান বৃথা এ সংসারের সৃষ্টি করেন নাই। যদি ইহা কেবল পাপপূর্ণ এবং অশান্তি পূর্ণ হইত তাহা হইলে তিনি বিশ্বপিতা এবং জগদ্বন্ধু হইয়া কেন ইহার সৃষ্টি করিলেন? এ সংসার তাঁহারই লীলা—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এই লীলার সহায়তা করিলে, এই লীলাতে যোগদান করিলে তিনি সমধিক প্রসন্ন হন। যে তাঁহার লীলাকে অস্বীকার করিয়া, ভীত হইয়া সংসার হইতে দূরে গহন বনে আশ্রয় গ্রহণ করে তাহার প্রতি তিনি দৈন্য প্রকাশ করেন; অবশ্য তাহাকেও তিনি শান্তি দান করেন, কেননা সে মুমুক্ষু কিন্তু সে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে না, সে তাঁহার লীলারস আস্বাদন করিতে পারে না।

এই জন্যই ভগবান গীতার অমূল্য উপদেশাবলী কোন মুমুক্ষু সংসারত্যাগী ঋষির নিকট উদ্ঘাটিত করেন নাই, এই জন্যই তিনি এ গুহ্য রহস্য যাহা পূর্ব্বে কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, তাহা সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পরমপ্রিয়পাত্র লীলাসহচর মহাকর্ম্মি পার্থের নিকট উদ্ঘাটিত করিলেন। কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ, কেননা ইহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম।

যে সমাজে সকলেই উদাসীন হইতে চায়, সে সমাজের মঙ্গল কোথায়?—তাহা হইলে সমাজ টিকে কি করিয়া?—

সেরূপ ধর্ম্ম কখনই সর্ব্বজনপ্রতিপাল্য হইতে পারে না—তাহাতে কেবল সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অমঙ্গল আনয়ন করে এবং রাজসিক উদ্যমের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবও শেষকালে তামসিক ভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। রজঃশক্তি-ব্যতীত সত্ত্ব টিকিতে পারে না—রজের মধ্য দিয়াই সত্ত্বে উঠিতে পারা যায়।

এই গীতায় ভগবান উপদেশ করিয়াছেন, যে কোন কার্য্যই হউক না কেন, যাহা সমাজস্থিতিসহায়ক তাহার অনুষ্ঠানেই ধর্ম্ম লাভ হইতে পারে। কিন্তু কর্ম্মযোগের শিক্ষা এই যে, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে, জানিতে হইবে যে সমস্ত কর্ম্মেরই প্রেরক এবং সংঘটক স্বয়ং ভগবান, জীব তাঁহার শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছে মাত্র, তিনি যন্ত্রী, জীব তাঁহার যন্ত্র মাত্র, তিনি কর্ম্মী, জীব উপলক্ষ মাত্র, তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই, তাঁহার সত্তা ব্যতিরেকে অন্য সত্তা নাই,—তাঁহার শক্তি ব্যতিরিক্ত অন্য শক্তি নাই, তাঁহার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য ইচ্ছা নাই। এই যে জ্ঞান, যাহা মায়া কাটাইতে পারে, এই যে জ্ঞান, যাহা জীবকে জীবন্মুক্ত করিতে পারে, ইহাই কর্ম্মযোগ। ইহা দ্বারাই কর্ম্মী নিশ্চলা শান্তি প্রাপ্ত হন। এই জ্ঞানের অভাবেই মানব জগতকে সুখ দুঃখময় বলিয়া জানে এবং প্রকৃত আনন্দ, যাহা জগতের স্তরে স্তরে, প্রতি অণুতে পর-মাণুতে উছলিয়া পড়িতেছে তাহা উপভোগ করিতে পারে না। সমস্ত বিশ্বে একটী মহা আনন্দের নৃত্য, একটী মহা আনন্দের

সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছে—ইহাকে ধরাই মানুষের চরম সার্থকতা, ইহাকে উপভোগ করাই মানুষের উন্নতি।

ভক্তি।

ভক্তি অর্থে যে কোন বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা। ভালবাসাও নানাপ্রকারের আছে—যেমন পিতামাতার সন্তানের প্রতি, প্রভুর ভৃত্যের প্রতি, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি ও শিষ্যের গুরুর প্রতি ভালবাসা; আবার বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞান ঘটিত নানাপ্রকার গভীর গবেষণাজনিত আনন্দ (Intellectual sentiment) প্রাপ্তি এবং তদ্ধেতু উক্ত বিষয়ে ভালবাসা, কবির নানাপ্রকার প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে সৌন্দর্য্যভোগজনিত আনন্দপ্রাপ্তি এবং সেই কারণে প্রকৃতিকে ভালবাসা, যিনি পরহিতাকাঙ্ক্ষী তাঁহার অন্যের হিত-চেষ্টায় আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি ও সেই কারণে পরহিতাকাঙ্ক্ষা এবং তদুদ্ভূত কার্য্যে ভালবাসা ইত্যাদি। এতন্মধ্যে যে ভাল-বাসায় পূজার ভাব আছে তাহাই ভক্তি। যাঁহাকে অথবা যে কার্য্যকে আমরা ভালবাসি এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়া থাকি, তাঁহাকেই অথবা সেই কার্য্যকেই আমরা ভক্তি করি।

ক্রমোন্নতি মানুষের স্বভাব, মুক্তিই মানুষের চরম পরিণতি। মানব কিম্বা মানবসমাজ সময়বিশেষে অধঃপতিত হইতে পারে, কিন্তু এ অধঃপতন তাহার চিরপতন নয়, অধোগতি এবং ঊর্দ্ধগতির লীলার মধ্য দিয়া মানুষ চরমপরিণতিতেই পৌঁছিবে। ইহা মানুষের স্বভাবেই বলিয়া দিতেছে। মুক্তি যদি মানুষের চরম পরিণতি না হয়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই যদি মানুষের শেষ অভিব্যক্তি না হয়, তবে সৃষ্টি একটী মহা শয়তানের খেলা, অনন্ত দাসত্বই মানুষের নিয়তি। কিন্তু ইহা হইতেই পারে না—কেন না, এ চিন্তায় মানুষের সমগ্র প্রাণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। জগতের সমস্ত জীবই যখন স্বাধীন হইতে চায়, সমস্ত জীবের স্বভাবেই যখন স্বাধীনতার ভাব অন্তর্নিহিত আছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া একটী অবস্থা আছেই আছে। এই সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অবস্থা, এই মুক্তির অবস্থা পাইতে হইলে, মানুষকে ক্রমে ক্রমে পাইতে হইবে। ক্রমোন্নত হইয়া যখন উন্নতির শেষ সীমায় উঠিবে, যখন আপনার মধ্যেই আপনাকে সম্পূর্ণ দেখিবে—বাহিরের কিছুরই অপেক্ষা রাখিবে না তখনই সে স্বাধীন, তখনই সে মুক্ত পুরুষ।

এই চরম পরিণতি মানুষের স্বভাব, কাজেই এই চরম পরিণতিতে লইয়া যায় বলিয়া ভক্তিও মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব।

কোন না কোন বিষয়ে, অথবা বস্তুতে, অথবা ব্যক্তিতে

তাহার ভক্তি, আছেই আছে। সে যতই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে ততই তাহার ভক্তিবৃত্তির সমধিক বিকাশ হয় এবং তাহার যতই অধঃপতন হইতে থাকে ততই তাহার এই বৃত্তিটী লোপ পাইতে থাকে। কিন্তু যতদিন সে মানুষ, তত দিন তাহাতে এই বৃত্তি অল্পাধিক পরিমাণে অন্তর্নিহিত থাকিবেই।

মানুষ কি করিয়া উন্নত হয়? কি করিয়া তাহার একটী সৎকার্য্য করিবার ইচ্ছা হয়? কি করিয়া সে তাহার গন্তব্য, তাহার আদর্শ স্থির করিয়া লয়? কোন একটী বস্তু, কোন একটী বিষয়, অথবা কোন একটী ব্যক্তি যখন তাহাকে আকৃষ্ট করে তখন সে সেইটীকে চায় এবং এই চাওয়া হইতে তাহার মনে তদ্বিষয়ে চিন্তা হয়। এই চিন্তা গভীর হইলেই তাহাকে ধ্যান বলা হয়। আমরা দেখিতে পাইতেছি যে এই স্থূল অথবা বহির্জগৎ সূক্ষ্ম অথবা অন্তর্জগতের বহিঃপ্রকাশমাত্র। বাহিরে যাহা কিছু কার্য্যরূপে প্রকাশ হইতেছে তাহার প্রথম উৎপত্তি কোথায়? প্রথমে উহা অন্তর্জগতে একটী চিন্তার আকারে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এবং ঐ চিন্তাই ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া আসিলে উহা চিন্তানুযায়ী কার্য্যের উৎপত্তির কারণ হইয়াছিল। ইহা প্রত্যেক বিষয়েই দেখা যায়। এমন কি একজন শিল্পী যখন একটী গৃহ প্রস্তুত করে, তখনও প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে, সে তাহার মনে মনে চিন্তাজগতে প্রথমে একটী গৃহের কল্পনা করিয়া লয়; কিরূপভাবে সে গৃহটী তৈয়ারী করিবে তাহার ভবিষ্যচ্ছবি

সে তাহার মনে আঁকিয়া লয়; এবং পরে যে গৃহটী হয় তাহা তাহার মানসিক প্রতিকৃতির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সেইজন্য ইহাই দেখা যায় যে মানুষের স্বভাব ও কার্য্য তাহার চিন্তানুযায়ী গঠিত অথবা কৃত হয়। কেহ যদি কাহারও প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহার চিন্তা করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃতিও ক্রমশঃ সেই চিন্তানুযায়ী হইয়া গঠিত হইবে; অর্থাৎ সে যাহাকে চিন্তা করিবে তাহার স্বভাব ক্রমশঃ তাহার মধ্যে সংক্রামিত হইবে। অন্যপক্ষে যদি কোন কার্য্য বা বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া সেই সময়ে জ্ঞানলাভ করিতে চায়, তাহা হইলেও ক্রমাগত গবেষণার দ্বারা সেই জ্ঞান ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইবে।

এইরূপে যাহাতে তাহার নিজ প্রকৃতির সহিত এবং তাহার পার্থিব বস্তুর সহিত বিরোধ উপস্থিত না হয় ইহাই মানুষের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়।

যাহা অসত্য, যাহা বিদাহী, যাহা হইতে প্রকৃত অশান্তির উৎপত্তি হয় তাহাই উন্নতিব্যাঘাতক—তাহা তাহাকে স্থায়ী-ভাবে আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রথমতঃ ভ্রমে পড়িয়া আকৃষ্ট হইলেও অবশেষে একদিন না একদিন তাহার স্বভাব বিদ্রোহী হইয়া উঠে, সে তখন তাহাহইতে বিযুক্ত হইতে চাহে। কিন্তু যাহা সত্য—অন্ততঃ তাহার পক্ষে সত্য—তাহাকে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উর্দ্ধে লইতে চাহে—তাহা তাহাকে স্থায়ীরূপে আকর্ষণ করে; যতদিন সে আকর্ষক

পদার্থের সহিত সম্যক্ একীভূত না হয়, ততদিন আকর্ষণ করে—যতদিন সে নিজের জীবন দ্বারা উহাকে সম্যক্ উপলব্ধি না করে ততদিন আকর্ষণ করে।

এইজন্যই জগতে মহাপুরুষপূজা প্রচলিত হইয়াছে। উহাতে মানব-সমাজের উপকার ভিন্ন অপকার নাই। সাধারণ-মনুষ্য প্রথমতঃই ঈশ্বরকে ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু উন্নত হইতে হইলে তাহাকে পূজক হইতে হইবেই। সে কিসের পূজা করিবে? স্বভাবতঃই সে মহাপুরুষপূজা করিবে।

এইরূপে "সত্যংশিবংসুন্দরং" মানুষের নিকট ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকেন, সে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অবশেষে সান্ত কিছুই তাহাকে শান্তি দিতে পারে না। তাহার হৃদয় অনন্তপ্রেমের জন্য কল্লোলিয়া উঠে, তাহার শক্তি অনন্তশক্তির অব্যাহত লীলার জন্য নাচিয়া উঠে, তাহার জ্ঞান সমস্ত জটিলতা, অন্ধকার এবং আবরণ ভেদ করিয়া দিব্য আলোকের জন্য, বুদ্ধত্বের জন্য জ্বলিয়া উঠে। সে তখন স্বয়ং ভগবানকে তাহার আদর্শ করিয়া লয়, তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া পড়ে, তাহার অণুরেণুতে ভগবদ্ভাব প্রবেশ করে এবং সামীপ্য, সালোক্য ইত্যাদি দান করে। সর্ব্বশেষে সে আর পৃথক থাকিতে পারে না, তাহার আত্মা পরমাত্মায় লীন হইয়া অনন্ত প্রেম, অনন্ত জ্ঞান এবং অনন্ত শক্তির আস্বাদ পাইতে থাকে।

প্রেম।

প্রেমই জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই যে অণুতে, অণুতে, পরমাণুতে, পরমাণুতে, বিশাল সৌরমণ্ডলের প্রত্যেক গ্রহে উপগ্রহে আকর্ষণ, ইহা প্রেম বই আর কি? যেদিন বিশ্বে প্রেমের অভাব হইবে, সেই দিন আমাদের এই পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, যে যাহার স্থানচ্যুত হইয়া জগতে এক মহাবিপ্লবের সূচনা করিবে। প্রেমের বলেই পশুপক্ষী জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের শৈশবকালে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, প্রেমের বলেই মানুষ পরিবারবদ্ধ এবং সমাজ-বদ্ধ হইয়া বাস করে।

যাহা বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে তাহাই ধর্ম্ম। প্রেমই বিশ্বকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে সুতরাং প্রেমই ধর্ম্ম। যে মহা-সত্ত্বের উপর নিখিলবিশ্ব প্রতিষ্ঠিত, ইহাই সেই মহাসত্ত্ব। প্রেমের বিকাশেই ধর্ম্মের বিকাশ, প্রেমের পরিণতিতেই ধর্ম্মের পরিণতি। মানবসমাজের মহামঙ্গল প্রেমেই নিহিত আছে। পারিবারিক প্রেমের বিকাশে পরিবারের উন্নতি, সামাজিক প্রেমের বিকাশে সমাজের উন্নতি, বিশ্বপ্রেমের বিকাশে বিশ্বের উন্নতি। পারিবারিক প্রেমের বলে মানুষ পরিবারের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে, সামাজিক প্রেমের বিকাশে নিজসমাজমধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে। কিন্তু কোন কোনও ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ নিজ-

প্রাণকে এরূপভাবে ব্যাপ্ত করিয়া দেন যে, তাঁহাদের প্রেম পরিবারকে অতিক্রম করিয়া, জাতিকে ছাপাইয়া, সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট প্রভৃতি এই শ্রেণীর প্রেমিক। মানবসমাজের পক্ষে এই তিন শ্রেণীর প্রেমই মঙ্গলময়।

পারিবারিক প্রেমের বিকাশে যে পরিবারের উন্নতি হয়, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন। জাতীয় প্রেমের বিকাশেই যে, জাতির উন্নতি হয়, এবং ইহার অভাবে, জাতির উন্নতির উপযোগী অন্যান্য সমস্ত কারণ সত্ত্বেও যে, জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী ; ইহা ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রমাণসাপেক্ষ।

ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্ত্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিত লোকের একটী বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়াছে যে, "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিয়াই ভারতবর্ষের অবনতি হইয়াছে ; যে সমস্ত দেশ ধর্ম্মচর্চ্চায় এবং ধর্ম্মকার্য্যে উৎসাহ প্রকাশ করে না, প্রকৃতপক্ষে সেই সমস্ত দেশই উন্নতি ও আনন্দের পথে চলিয়াছে ; এবং ভারতবর্ষ উক্তদোষজন্য সর্ব্বপ্রকার উন্নতি হইতে বিচ্যুত হইয়া একটী নিরানন্দময় জড় পদার্থ স্বরূপ হইতে চলিয়াছে। যাঁহাদিগকে আমরা মান্য গণ্য এবং দেশহিতৈষী জননায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহারাও অনেকে এইরূপ ছেলেমী প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না।

যে বিশাল মহাদেশসদৃশ ভারতবর্ষ তাহার মজ্জাগত শিক্ষা

দীক্ষাগুণে, তাহার পূর্ব্বগৌরব হারাইয়াও আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী, কালের ভীষণ ঝঞ্ঝা করকা সহ্য করিয়াও ধরাপৃষ্ঠে তাহার স্থান হইতে একেবারে লুপ্ত হয় নাই, যে ভারতবর্ষ, আক্রমণের পর আক্রমণ, নিষ্পেষণের পর নিষ্পেষণ সহিয়াও এখনও জীবন স্পন্দনের ও ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের আভাস দিতেছে, তাহার সহস্র সহস্র বৎসরের কেন্দ্রীভূত মজ্জাগত প্রধান ভাবটীকে একেবারে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিতে চাওয়াকে, আমরা বালকত্ব বই আর বড় বেশী কিছু বলিতে প্রস্তুত নহি।

আমরা অবগত আছি যে প্রথিত নামা ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় একবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত দেখা করিতে গিয়া তাঁহার নিকট ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে বর্ত্তমান যুগের অলৌকিকপুরুষ, মহাকর্ম্মি-বিবেকানন্দের শক্তিদাতা উদ্বোধয়িতা পরমহংসদেব উত্তর করিয়াছিলেন যে পাল মহাশয়ের মতে তিনি বড়ই আশ্চর্য্য হইলেন। যে ধর্ম্মরাজ্যের কথা লইয়া সনাতন হিন্দু শাস্ত্রের বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ ব্যস্ত এবং যাহা উক্তশাস্ত্রগুলির মতে সর্ব্বমঙ্গলনিধান, তাহাকেই তিনি ভারতের অবনতিকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন; ইহা অপেক্ষা দুঃখের কারণ আর কি হইতে পারে? প্রকৃত পক্ষে এরূপ গুরুতর বিষয়ে এরূপ দায়িত্বহীনতা বড়ই ধৃষ্টতার পরিচায়ক।

আমরা সাধারণ বুদ্ধিতে কথাটা একটু গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পারি। যাঁহারা বলেন ভারত-

বর্ষ "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিয়া দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপনীত, তাঁহারা ধর্ম্ম অর্থে কি বুঝেন ? তাঁহারা ইতিহাস আলোচনা করিয়া কি পাইয়াছেন ? ভারতের যদি "ধর্ম্মচ্যুতি" না হইত তাহা হইলে আজ তাহার কি এরূপ দুর্দ্দশা হইত ? মুখে "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিলেই কি ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হইল ? ধর্ম্ম কি কতকগুলি উদ্দেশ্যহীন আচার মাত্র ? হিন্দুর বেদ বেদান্তে কি তাহাই বলা হইয়াছে ? যদি তাহা না হইয়া থাকে তবে ধর্ম্ম কি আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে একেবারে লুপ্ত নয় ? ধর্ম্মের একটী সাক্ষাৎ ফল কি এই নয় যে, উহা মানুষের ক্ষুদ্রস্বার্থগণ্ডী ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর রাজ্যে লইয়া যায় ? ধর্ম্মে মানুষকে কি ক্রমেই স্বার্থত্যাগ করাইয়া, প্রেমিক করিয়া, তাহার হৃদয়ের বিস্তার করিয়া দেয় না ? বেদান্ত বলিতেছেন, সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন করাই ধর্ম্মের পরিণতি।

যদি তাহাই হয়, মানুষকে ক্রমেই মহত্তর করা, মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তোলা যদি ধর্ম্মের প্রধান কাজ হয় ; যদি ধর্ম্মে মানুষের নীচতা, সঙ্কীর্ণতা, মিথ্যাব্যবহার, শঠতা প্রভৃতি উন্মূলন করে, তবে "ধর্ম্মধর্ম্ম" করিয়া সমাজ কি করিয়া অধঃ-পতিত হয়, তাহা কেহ কি বলিয়া দিতে পারেন ? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রেম এবং ধর্ম্ম এক। যেখানে ধর্ম্ম আছে, সেখানে প্রেম আছে। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে সমাজ-মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী, যেখানে প্রেম আছে, সেখানে মহা-শক্তি আছে, কেননা প্রেমের বলে মানুষ অসাধ্যসাধন

করিয়া ফেলে, প্রেমে মূক বাচাল হয়, পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করে।

ভারত "ধর্ম্ম-ধর্ম্ম" করিয়া অধঃপতিত হয় নাই, ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ করিয়াই এরূপ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস খুলিয়া দেখ—যখন হইতে উহার অধঃপতন আরম্ভ, সেই সময় হইতে লক্ষ্য কর, দেখিতে পাইবে, কিরূপ নীচতা, কিরূপ বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা ও হিংসায় উহা রঞ্জিত হইয়াছে। এই সমস্ত ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে হয় নাই——ধর্ম্মের অভাবেই হইয়াছে।

তক্ষশীলা, জয়চন্দ্র প্রভৃতি জাতীয়স্বার্থ নিজস্বার্থে বলি দিয়া, ভারতের অধঃপতনের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। এই ব্যবহার কি বড়ই ধর্ম্মের পরিচায়ক? ধার্ম্মিক লোক এইরূপ করিয়া থাকে না কি? তাহার পর বাদ্‌শাহী আমল ও তৎ-পরবর্ত্তী সময়েও ভারতান্তর্গত যে জাতি যখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে, সাত্ত্বিকভাবের অভাবেই সে জাতির তখন পতন হইয়াছে। রজঃ হইতে অহঙ্কারের এবং অহঙ্কার হইতে স্বার্থপরতার সৃষ্টি হয়।

ইহা হইতেই গৃহভেদ আরম্ভ হয়, গৃহভেদই জাতীয় পতনের প্রধান কারণ।

ঘোর রাজসিকভাবে মত্ত হইয়া রাজপুত, রাজপুতের সর্ব্বনাশ করিল, গৃহভেদে মহাশক্তিশালি মারাঠাসমিতির পতন হইল; ঘৃণিত, অকথ্য, বিশ্বাসঘাতকতায় দোর্দ্দণ্ড শিখজাতির

অধঃপতন হইল! ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে যেরূপ কতকগুলি শক্তিশালীপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ ইতিহাসে সচরাচর দেখা যায় না। পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহ, মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত রাজনৈতিক নানা-ফর্‌নবীস্; মহীশূরে হায়দার প্রভৃতি অসাধারণ পুরুষগণ এই সময়েই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অথচ ইঁহারা কেহই স্থায়ী কিছুই করিয়া যাইতে পারিলেন না। ইঁহাদিগের প্রতিভা অসাধারণ ছিল, তবুও কেহই ত স্থায়ীরূপে একটী জাতি সংগঠন করিয়া যাইতে পারিলেন না।

ইহার কারণ আর কিছুই নয়। যে ধর্ম্মবল মূলে থাকিলে সমস্ত কার্য্য একটী মহাশক্তি-প্রতিষ্ঠিত হয়, যে ধর্ম্মজীবন জাতীয়জীবনের রক্তাধার স্বরূপ হইয়া উহার শিরায় শিরায় জীবনশোণিত সঞ্চালন করিয়া উহাকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, সেই ধর্ম্মবল ইঁহাদিগের মধ্যে কাহারও ছিল না। ধর্ম্মের আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ, মনুষ্যত্বের আদর্শ, ইঁহারা কেহই দেখাইতে পারেন নাই; নতুবা যদি ঐরূপ ব্যক্তিগত প্রতিভার সহিত ধর্ম্মের প্রেরণা সংযুক্ত হইত, তাহা হইলে, আজ ভারতের ইতিহাস ভিন্ন আকার ধারণ করিত।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে, ধর্ম্মের চরম পরিণতি যখন স্বার্থ-পরতার সর্ব্বাঙ্গীন লোপে, দেশকালজাতি-নির্ব্বিশেষে সমস্ত আত্মবৎ দেখিয়া ভূমাতে মিশিয়া যাওয়াই যখন ধর্ম্মের

শেষাবস্থা, তখন ধর্ম্মলাভ করিলে আর স্বদেশপ্রেম, স্বজাতি-প্রেম থাকে কৈ ?

কিন্তু ইহাও চিন্তাশীলের কথা নহে। ধর্ম্মের চরম পরিণতি মানুষ কি একদিনেই লাভ করিয়া বসে ? উহাতে পৌঁছিবার কি কোন পথ নাই ? সে পথের প্রথম, মধ্য, শেষ—সমস্ত কি একই ?

যদি দেশের কোন মহাপুরুষ স্বার্থের গণ্ডী সম্পূর্ণ ভঙ্গ করিয়া বিশ্বপ্রেমে পৌঁছেন, তাহাতে দেশের সম্পূর্ণ লাভ ব্যতীত কোন ক্ষতি নাই ; যেমন নদীতে প্লাবন হইলে খাল, ডোবাসকলও ভরিয়া উঠে, তেমনই প্রেমের চরম-আদর্শ-সংস্পর্শে, যাহা ক্ষুদ্র তাহাও মহৎ হইয়া থাকে ; যে নিতান্ত স্বার্থপর সেও জ্বলন্তত্যাগের দৃষ্টান্তে, কতকটা স্বার্থত্যাগ করিতে শিক্ষা করে। যখন মহাপ্রেমিকের হৃদয়, উদ্বেল, উধাও হইয়া ছুটিয়া চলে ; যখন ইহা বিশ্বকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হয়, তখন দেখা দেখি,—চারিদিকের খানা ডোবাও ভরিয়া উঠে ; যে কেবল নিজের হিতচেষ্টা দেখিতেছিল, সে, অন্ততঃ, আর দশজনের হিতপ্রয়াসে ব্যগ্র হইয়া উঠে ; যে নিজপরিবার এবং কূলের মঙ্গল লইয়া ব্যস্ত ছিল, সে সমগ্র দেশের মঙ্গলসাধন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসও ইহার স্পষ্ট-সাক্ষী-স্বরূপ। যখন যোগী ঋষির ঝঙ্কারে ভারত নিনাদিত, যখন ভারতের ঋষি সমাহিত হইয়া, নিজ প্রাণের সহিত বিশ্বপ্রাণস্পন্দনের ঐক্য

উপলব্ধি করিতেন, তখন ভারতের দুর্দ্দিন নয়; যখন বেদান্ত সাঙ্খ্য, যোগ প্রভৃতির সৃষ্টি, যখন সম্যক্ জ্ঞানাস্বাদ এদেশের লোকে পাইত, তখন এদেশ জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল; যখন বুদ্ধের প্রেমবাদ ভারত প্লাবিত করিয়াছিল, তখন ভারতেতিহাসের আনন্দদিন। আবার পতিতভারতের যখন কোনও উন্নতি চেষ্টা কিছুমাত্র সাফল্য লাভ করিয়াছিল তখনও ধর্ম্মকে সহায় করিয়াই। নানকের ধর্ম্মপ্রাণতায় সঞ্জীবিত, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত শিখেরাই পরবর্ত্তীকালে কিছু জীবনীশক্তির পরিচয় দিয়াছিল; ধর্ম্মপ্রাণ, ভবাণীপুত্র, রামদাসশিষ্য-শিবাজী-মহারাজই মহারাষ্ট্রজাতির সৃষ্টিকর্ত্তা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কেবল রজঃ, কেবল শক্তি, সত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে কার্য্যকরী হয় না। প্রকৃতিতেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে; এই শক্তি মানবের অকল্যাণকর হইতেও পারে, আবার নিয়ন্ত্রিত হইলে কল্যাণকর হইতেও পারে, বৈদ্যুতিক শক্তি মানবের প্রাণনাশ করিতে পারে, আবার কাজে লাগাইলে মানবসমাজে নানাবিধ মঙ্গলের উপায় হয়। বায়ু আমাদিগের প্রাণস্বরূপ, আবার এই বায়ুই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলে, জগতে প্রলয়ের সৃষ্টি করে। এই সত্য সর্ব্ববিধশক্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

কেবল রাজসিক শক্তি যে স্থায়ীভাবে কিছু করিতে পারে না, এবং স্থায়ীকার্য্য করিতে হইলে যে উহাকে সত্ত্বপ্রতিষ্ঠিত হইতে হয়, ইহার প্রমাণ, আমরা বৈদেশিক ইতিহাস হইতেও

পাইতেছি। যখনই যে কোন দেশে সাত্ত্বিকশক্তির মহাস্ফুরণ ও বিকাশ পাইয়াছে; কিম্বা যখনই যে কোন কার্য্য সত্ত্বসম্ভূত হইয়াছে তাহা যে জগতের স্থায়ী মঙ্গলকারণ, ইহার প্রমাণ বৈদেশিক ইতিহাসও দিতেছে।

ঘোর রাজসিকভাবে উন্মত্ত ফরাসীজাতি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে বিপ্লবের যে মহা আয়োজন করিয়াছিল, তাহা আশানুরূপ ফল প্রদান করে নাই। সত্ত্বপ্রবণতা, পরদুঃখকাতরতা, ফরাসী-বিপ্লবের মূলকারণ নহে; নিজ নিজ অধিকার আয়ত্ত করিবার জন্য তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সত্ত্বের উপর ফরাসী-বিপ্লব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; উহা মহারজঃ-শক্তিকে আশ্রয় করিয়াছিল; ভগবদ্বিশ্বাসীগণ উহার প্ররোচক ও চালক নহে; ভগবানকে উড়াইয়া দেওয়াই বিপ্লবকর্ত্তাদের ইচ্ছা ছিল; কোন প্রকার স্থায়ী বিশ্বাস উহা স্থাপন করিতে চেষ্টা করে নাই, কেবল পুরাতন বিশ্বাসগুলির ধ্বংসসাধন করিয়াই বিপ্লববাদীরা ক্ষান্ত হইয়াছিল; সেইজন্যই আন্দোলন স্থিতি-শীল না হইয়া কিছুদিন পর চূরমার হইয়া গেল।

আবার দেখ, প্রকৃত ধর্ম্মভাবে মাতোয়ারা হইয়া, ঈশ্বরকে মাথায় রাখিয়া, কেবল নিজনিজ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, অধিকার প্রভৃতি বৃদ্ধিহেতু চেষ্টা না করিয়া, অধর্ম্মগ্লানিব্যথিত-পরদুঃখ-কাতর-মহাত্মাগণ যখনই সমাজোন্নতিচেষ্টা করিয়াছেন, তখনই তাহা বিশেষমঙ্গল কারণ।

অসভ্য, কদাচার ও কুপ্রথামগ্ন, পরস্পর হিংসাপরায়ণ,

দস্যুবৃত্তি, আরবদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া মহম্মদের বিশাল অন্তঃকরণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি আল্লার আদেশের অপেক্ষায় সাধনরত রহিলেন। একদিন, তিনি এই আদেশ, এই বাণী শুনিলেন; তাঁহাকে কি করিতে হইবে তাহা নিঃসংশয়িতরূপে জানিয়া কর্ত্তব্যে কৃতসংকল্প হইলেন।

তাহার পর কি হইল? কোথায় সহায়-সম্বলহীন এক সামান্য গৃহস্থমাত্র—যাঁহার চল্লিশ বৎসর জীবনের মধ্যে, বাহিরের লোকে বিশেষ কোন সাড়া শব্দ পায় নাই; যে তাহার যুবাবস্থায়, এক সমৃদ্ধা বিধবার ব্যবসায়ের তদ্বিরতদারক করিত—আর কোথায় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার বিরাট চিন্তাশক্তিতে আন্দোলিত অসভ্য, দস্যু, বর্ব্বরদিগের মধ্য হইতে একটী মহাশক্তিশালী জাতির সৃষ্টি—যে জাতি দেখিতে দেখিতে বিজয়দর্পে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত করিয়া, প্রশান্তমহাসাগর হইতে আটলান্টিকমহাসাগর পর্য্যন্ত তাহাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতার পতাকা উড়াইয়া ছুটিয়া চলিল!

গ্রীক ও রোমানদিগের পতনের পর ইউরোপে যে বর্ব্বরতা বিরাজ করিতেছিল, যদি তাহাই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে আজ সুসভ্য, দৃপ্ত ইউরোপের ছবি আমরা দেখিতে পাইতাম না। সেই বর্ব্বরতার অন্ধতামস ভেদ করিয়া খৃষ্টীয়ান মিশনরীগণই ইউরোপে শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক বিস্তার করেন; এবং তাহা হইতেই ক্রমশঃ মধ্যযুগের পোপ্‌দিগের সমস্ত ইউরোপের উপর প্রভুত্বের সৃষ্টি।

আবার যখন সময়ে ও ক্ষমতায় পোপ্‌দিগের অধঃপতন আরম্ভ হইল; যখন রোমান্‌ ক্যাথলিকদিগের পূর্ব্বনিষ্ঠা লোপ পাইতে লাগিল, তখন জার্ম্মানির এক নগণ্য ধর্ম্মযাজক মার্টিন্‌লুথার ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য, বজ্ররবে উত্থিত হইলেন; এবং ইহার ফলই প্রোটেষ্টান্‌টিজম ও তাহা হইতেই ইউরোপের বর্ত্তমান অবস্থা। যদিও প্রবল ফরাসীজাতি মার্টিন্‌লুথারের প্রবর্ত্তিত এই নূতন আন্দোলনে প্রথমে বা পরে যোগ দেয় নাই, তথাপি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসীবিপ্লব, বহুপূর্ব্বে মার্টিন্‌লুথার যে বীজ উপ্ত করিয়াছিলেন, তাহারই এক ফল।

ফরাসীবিপ্লব যদিও একটী অস্বাভাবিক, প্রবল বন্যার মত আসিয়া, প্রথমে ফরাসীদেশ ও তৎপর সমস্ত ইউরোপকে উহার তাণ্ডবলীলায় কম্পিত ও বিধ্বস্ত করিয়া বহিয়া গিয়াছিল, তথাপি উহা ফরাসীদেশের ও সমগ্র ইউরোপের বহুল উপকার করিয়াছিল; ঐ বন্যা চলিয়া গেলেও, সঙ্গে সঙ্গে অনেক কুসংস্কার, অনেক আবর্জ্জনা, ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, ধৌত করিয়া লইয়াছিল ও দেশকে ভবিষ্যতে উর্ব্বর ও সরস করিবার জন্য অনেক পলিও রাখিয়া গিয়াছিল।

বর্ত্তমানকালে ইংলণ্ডের শিক্ষা দীক্ষার ফল সমস্ত পৃথিবী ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ইংরেজের মত বিরাটকীর্ত্তি ইতিহাসে স্বল্পদৃষ্ট। আমেরিকার যুক্তসাম্রাজ্যও এই ইংরেজ জাতিরই কীর্ত্তি। ইহাদের বংশধরগণই এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই উপনিবেশ হইতেই বর্ত্তমানের

মহৈশ্বর্য্যশালী যুক্তসাম্রাজ্যের উৎপত্তি। ইংলণ্ডের ইতিহাসে বর্ত্তমান ইংলণ্ডের উন্নতিতে পিউরিটান্‌দিগের স্থান অতি উচ্চে। এই পিউরিটান্‌গণই ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের বিখ্যাত বিপ্লবের কারণ। এই আন্দোলনই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ইতিহাসের গতি ও আকৃতি দিয়াছে। এই পিউরিটানদিগের কার্য্যের ফলেই ইংরেজ জাতি তৃতীয়উইলিয়মের সময় রাষ্ট্রনৈতিক বিধানগুলি নূতন ছাঁচে ঢালিয়া লইল। উহাদিগের ধর্ম্মপ্রাণতা সম্বন্ধে প্রত্যেক ইতিহাস পাঠকই অবগত আছেন। উহাদিগের অমিততেজ, অটলসংকল্প, অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ও আত্মত্যাগ এবং অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি, উহারা ধর্ম্মপ্রাণতা হইতেই লাভ করিত। ইতিহাসও এ কথার সাক্ষী।

পিউরিটান্‌গণ তাহাদিগের ধর্ম্মমতের জন্য অনেক অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কতক, আর এই অত্যাচার—উৎপীড়ন সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, দেশ ত্যাগকরতঃ আমেরিকায় আশ্রয় লইল। সেই হইতেই যুক্তসাম্রাজ্যের ইংরেজউপনিবেশ এবং উহা হইতেই বর্ত্তমান যুক্তসাম্রাজ্যের সৃষ্টি। ধর্ম্মরক্ষার্থে দেশত্যাগী এই পিউরিটান্‌গণই বর্ত্তমান যুক্তসাম্রাজ্যের পিতা।

ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, কোন জাতিরই ধর্ম্মের উন্নতিতে, সামাজিক অথবা রাষ্ট্রনৈতিক অবনতি হয় না; পরন্তু ধর্ম্মের উন্নতিতেই মনুষ্যত্বের উন্নতি, এবং মনুষ্যত্বের উন্নতি হইতেই অন্য সর্ব্বপ্রকার উন্নতি।

আমাদের দেশে, অনেকের এরূপ বিশ্বাস আছে যে পাশ্চাত্যেরা ধর্ম্মহীন তথাপি উন্নত এবং আমরা ধার্ম্মিক হইয়াও অবনত। এ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রান্ত।

সনাতন উদার ধর্ম্ম আমাদের এই দেশেই এককালে প্রচারিত হইয়াছিল এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই ধর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছিলেন—ইহাতে যে গৌরব করিতে হয়, আমরা করিতে পারি। মহত্ত্বের বীজ আমাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন-ভাবে লুক্কাইত, অল্প চেষ্টাতেই উহা আবার ফলফুলশোভিত মহা মহীরূহে পরিণত হইতে পারে—এই আশায় যে গৌরব, তাহা আমাদের।

কিন্তু আমাদের অবস্থার সহিত পাশ্চাত্যদিগের অবস্থার তুলনা করিতে গিয়া, যদি আমরা ধার্ম্মিক সাজিয়া বসি, তবে তাহা ধৃষ্টতা। উহাদিগের ত্যাগ, অকুতোভয়তা, জ্ঞান-পিপাসা, উদ্দেশ্যের জন্য সর্ব্বস্বসমর্পণ; উহাদিগের পরস্পর ঐক্য প্রভৃতি অশেষ গুণাবলি আমাদিগের অপেক্ষা উহারা যে. মনুষ্যত্বে অনেক শ্রেষ্ঠ, তাহারই পরিচায়ক। মনুষ্যত্বই ধর্ম্মের মাপকাঠি—অন্য কিছুই নহে। ধর্ম্মে বড় না হইলে মনুষ্যত্বে বড় হইতে পারে, ইহা মনে করাও বাতুলের কার্য্য।

স্বজাতি প্রেম না থাকিলে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না। স্বজাতিপ্রেম বড় উচ্চ কথা; উহাতে অনেক ত্যাগ, অনেক মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। বহুলোকের সমবেতশক্তিতে যেখানেই কোন কার্য্য হইতেছে, বুঝিতে হইবে, সেখানে

মনুষ্যত্ব আছে; নতুবা হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা সে কার্য্যকে পণ্ড করিয়া দিত।

আমরা এক হইয়া, সমবেতশক্তিতে কোন কার্য্য করিতে পারি না; তাহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল আমাদের চরিত্রহীনতা। নিজেদের মধ্যে কাহাকেও বড় হইতে দেখিলে আমাদের চোখ টাটায়, নিজের স্বার্থ, সুযোগ, সুবিধা, সামান্য ত্যাগ করিতে পারি না, অহঙ্কারে ফুলিয়া কাহারও কথা গ্রাহ্য করি না, কেবল নিজ মতই খাঁটী, আর যাহা কিছু তাহা একেবারেই আবর্জ্জনারাশি—এইরূপ আমাদের ধারণা; সামান্য ক্রোধের কারণেই অপরের অনিষ্ট করিয়া বসি, বাধ্য হইয়া যথেষ্ট সহ্য করিতে পারি, স্বেচ্ছায় অপরের ত্রুটি একেবারেই সহ্য করিতে অনিচ্ছুক; নিজদোষান্ধ, অথচ পরের কেবল দোষই দেখিয়া থাকি; ধীরতা, সহিষ্ণুতা একেবারেই নাই, তমোমগ্ন ও ঘোর আলস্যপরায়ণ, কিছু না করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে আপত্তি নাই; কিন্তু সমাজহিতার্থে যদি তিল মাত্র চেষ্টা করি তবে পরক্ষণেই তাহার বিরাটফলের আশায় চঞ্চল হইয়া উঠি; উদ্দেশ্য দৃঢ় রাখিতে পারি না; অভীঃ হওয়া ত দূরের কথা, সত্যের জন্য, জ্ঞানের জন্য, ত্যাগে অসমর্থ হইয়া কাপুরুষতারই পরিচয় দিতেছি অথচ, আমরা ধার্ম্মিক জাতি; আর পাশ্চাত্যেরা ধর্ম্মহীন! এ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। এ ধর্ম্ম যে কোথায় তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম।

বৈদেশিকমনীষী দার্শনিক-জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল এ সম্বন্ধে কি

লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই বলিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব।

"Consider the savage: he has bodily strength, he has courage, enterprise, and is often not without intelligence; what makes all savage communities poor and feeble? The same cause which prevented the lions and tigers from long ago extirpating the race of men—incapacity of co-operation. It is only civilised beings who can combine. All combination is compromise. It is the *sacrifice* of some portion of individual will, for a common purpose. The savage can not bear to sacrifice, for any purpose, the satisfaction of his individual will. His social care cannot even temporarily prevail over his selfish feelings, nor his impulses bend to his calculations.

* *

As any people approach to the condition of savages or of slaves, so are they incapable of acting in concert." Dissertations and Discussions.

"Consider even war, the most serious business of a barbarous people; see what a figure rude nations, or semi-civilised and enslaved nations, have made against civilised ones, from Marathon downwards. Why? Because discipline is more powerful than numbers, and discipline, that is, perfect co-operation, isan attribute of civilisation."

একটী অশিক্ষিত বর্ব্বরের কথা মনে কর: তাহার শারীরিক শক্তি, সাহস, বিপজ্জনক কার্য্য করিবার উদ্যম আছে এবং অনেক সময়ই সে বুদ্ধিমানও বটে; তবে অসভ্য সমাজ গুলিকে কিসে অনুন্নত ও শক্তিহীন করিয়া রাখে? সম্মিলিত শক্তিতে কার্য্য করিবার অক্ষমতা ভিন্ন সে কারণ আর কিছুই নহে, যাহা থাকিলে সিংহব্যাঘ্রগণ বহুদিন পূর্ব্বেই মানবজাতির ধ্বংস সাধন করিত। কেবল শিক্ষিত সমাজই সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারে। সম্মিলিত হইতে হইলেই একটা মাঝামাঝি পথে চলিতে হয়।

ইহাতে সাধারণ একটী উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ইচ্ছার কতক অংশ ত্যাগ করিতে হয়। বর্ব্বর, কোন কারণেও, তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে খাটো করা সহ্য করিতে পারে না। সমাজের ইষ্টানিষ্ট ক্ষণকালের জন্যও ব্যক্তিগত ইষ্টানিষ্টাপেক্ষা তাহার নিকট গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না এবং তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলিও তাহার বুদ্ধির দ্বারা সংযত হয় না।

* * * *

যেমনি কোন জাতি অসভ্য অথবা পরাধীন হইতে থাকে, অমনি তাহাদের সমবেত শক্তিতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা লোপ পাইতে থাকে। বর্ব্বরদিগের বিশেষ কার্য্য যে যুদ্ধ, তৎসম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া দেখ; অসভ্য অথবা অর্দ্ধসভ্য জাতিগুলি, উন্নত এবং শিক্ষিত জাতিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া, ম্যারাথন্ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত কি হাস্যাস্পদচিত্রই না অঙ্কিত

করিয়াছে। কেন?—এরূপ কেন হইল? কেন না, সামরিক শিক্ষা—যাহাতে সমরার্থে অধিনায়কের অনুজ্ঞা বিচাররহিত হইয়া পালন করিতে হয়—সৈন্য সংখ্যা হইতে অধিক কার্য্য করে, এবং এই শিক্ষা লাভ করিতে গেলেই, সম্পূর্ণরূপে সমবেত হইয়া কার্য্য করিতে হয়; আর এইরূপ কার্য্য কেবল শিক্ষিত জাতিরাই করিতে পারে।

কয়েকটী অপবাদ খণ্ডন।

কয়েকটী মিথ্যা অপবাদে আমরা দূষিত; সেগুলি প্রকৃত কি না, তাহাই আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভাষা।—আজকাল একটা কথা শুনা যায় যে আমাদের ঐক্য ও উন্নতি সুদূরপরাহত, কেননা আমাদের কোন একটা সাধারণ ভাষা নাই। ভারতের এক এক রকম ভাষা; এই ভাষাগত অনৈক্য যখন আছে, তখন আর আমাদের উন্নতি কি করিয়া হয়? এই অনৈক্যের জন্যই আমরা মিলিত হইতে পারি না, পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার সময় অন্যান্য দেশের বিষয় চিন্তা করেন বলিয়া মনে হয় না।

ভারতবর্ষ একটী প্রকাণ্ড দেশ, লোক সংখ্যায় ও আয়তনে প্রায় সমস্ত ইউরোপের সমান; এত বড় একটী দেশ উন্নত

হইলে, জগতে তাহার স্থান ও মাহাত্ম্য যাহা হইবে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন হইয়া পড়ে। কাজেই এত বড় বিরাট-কার্য্য যে বড় সস্তায়, বড় সহজে, বিনা আয়াসে হইবে তাহা নয়। বরং যেরূপ বিরাটকার্য্য, সেইরূপ বিরাটত্যাগ ও উদ্যম সাপেক্ষ। সেই ত্যাগ ও উদ্যমও বহুসময়সাপেক্ষ। হঠাৎ ঘুম হইতে উঠিয়া, চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে আমাদের দেশকে একেবারে একটা মহোন্নত দেশ বলিয়া দেখিব, এরূপ আশা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা কল্পনারাজ্যেই যদি বরাবর বাস করিতে পারেন তবেই সুখী, নতুবা আশায় বাজ পড়িবে।

শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ, কঙ্কালসর্ব্বস্ব রোগীকে হঠাৎ ঐন্দ্র-জালিক উপায়ে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ, তেজঃকান্তিবলসম্পন্ন, স্বাস্থ্যকায় দেখাও যেমন সম্ভবপর, তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত প্রকারের আশাও তদ্রূপ। রোগী যখন তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য লাভ করিয়া উত্তরো-ত্তর শ্রীসম্পন্ন হইতে আরম্ভ করে, তখন যেমন প্রত্যহ নাড়ী টিপিয়া, তাপমান যন্ত্র দেখিয়া, ষ্টেথেস্কোপ লাগাইয়া, তাহার শরীরের অবস্থা সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় না, তাহার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সুস্থ, সতেজ হইয়া, আপনা হইতেই তাহার পরিচয় দিন দিন দিতে থাকে, সেইরূপ বহুকালের অবনত সমাজ শরীরেও স্বাস্থ্য যখন ক্রমশঃ সঞ্চারিত হইতে থাকে, সেই সঞ্চারণসময়ে সমাজের ছোট বড় সকল কার্য্যে তাঁহার উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই উন্নতি হঠাৎ হইতেই পারে না।

কাজ যত বড় হয়, উদ্যমেরও সেই অনুসারে, অধিক প্রয়োজন হয়। তাহাই বলিয়া, বড় কাজ হইতে, বিশাল আদর্শ হইতে, ক্ষুদ্রকাজ, সঙ্কীর্ণ আদর্শ বাঞ্ছনীয় নয়। যাক্ এসব কথা, পূর্ব্বে যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই দেখা যাক্।

আমাদের এতবড় মহাদেশসদৃশ একটা দেশে না হয় অনেক ভাষা আছে, আমরা না হয় সেইজন্যই এত অবনত ; কিন্তু লোক সংখ্যায় ভারতবর্ষ যাহার প্রায় সাতগুণ, সেই ক্ষুদ্র গ্রেটবিটেন কি করিয়া এত বড় হইল ? গ্রেটবিটেনে ত একটী ভাষা নয়। আইরিশদিগের নিজ ভাষা আছে, স্কচদিগের আছে, এমন কি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র ওয়েলশ্, যাহা ইংলণ্ডের মধ্যে ডুবিয়া আছে বলিলেই হয়, তাহারওত একটী নিজস্ব ভাষা আছে। এতবড় ভারতবর্ষে একটী ভাষা নাই বলিয়া রোদন করা নিতান্ত আদুরে ছেলের কান্না অথবা মায়া কান্না বলিয়া বোধ হয়। মনুষ্যরূপী অনেক হাঙ্গর কুম্ভীরবৎ জানোয়ার আছেন, যাঁহারা আমাদের দুঃখে এইরূপ চক্ষুজল (crocodile tears) সম্বরণ করিতে পারেন না।

লোকসংখ্যায় ভারতবর্ষ অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরির প্রায় সাতগুণ। এই অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী রাজ্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে একটি শক্তি। অথচ এই দেশের লোক নানাভাষা বলিয়া থাকে।

ভারতের ন্যায় এত বড় একটী দেশ কখনও এক ভাষাভাষী হইতে পারে না। ইহা অসম্ভব। ইহা আশা করা অন্যায়। তবে একটী ভাষা, সাধারণ ভাষা, এই অর্থে হইতে পারে যে

সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিলে সমস্ত প্রদেশের লোকই বুঝিতে পারিবে।

বিশেষভাবে কোন চেষ্টা না করাতেও হিন্দীর যেরূপ প্রচলন আছে, তাহাতে রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে সামান্য চেষ্টা করিলেই, হিন্দী এদেশের সকলেরই বোধগম্য করা সম্ভবপর হয়। আমাদের গভর্ণমেণ্টের অধীনে সমস্ত বিদ্যালয়গুলিতেই যদি মাতৃভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দীশিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তাহা হইলেই অল্প দিনেই সমস্ত ভারতে হিন্দী ছড়াইয়া পড়িবে।

জাতিভেদ—হিন্দুদিগের শাস্ত্রে জাতিভেদের প্রথা প্রচলিত আছে; এই হিন্দুশাস্ত্র ও জাতিভেদ হিন্দুদিগের উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা অনেকের ধারণা।

জাতিভেদ কোনও না কোন আকারে সমস্ত দেশেই আছে, তাহা আজকাল শিক্ষিত সমাজের অবিদিত নহে।

ইংলণ্ডেও সমাজিক ব্যাপারে আভিজাত্যের মর্য্যাদা কিরূপ প্রবল তাহা অধুনা আমাদের অবিদিত নাই। রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারেও ইহা বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। মনে কর, ইংলণ্ডের যিনি প্রধানমন্ত্রী তিনি যদি লর্ড না হন, তাহা হইলে, হলেনই বা তিনি প্রধান মন্ত্রী, লর্ড সভায় গেলে তাঁহার বসিবার স্থান হইবে না। ইহা কম আভিজাত্যের পরিচায়ক নহে।

অনেকে বলিয়া থাকেন ইংরেজদিগের আগমনে আমাদের

দেশে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু ঐ কথা কত দূর যুক্তিসঙ্গত তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। জাতিভেদ যে কোন্ দৃষ্টান্তকে, কোন্ আদর্শকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়া গেল, তাহা বলাও দুঃসাধ্য। ইংরেজদিগের দৃষ্টান্তে জাতিভেদ উঠিয়া গিয়াছে, একথা আমরা বলিতে পারি না। আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে সমস্ত ইংরেজগণ এদেশে আসিতেছে এবং পূর্ব্বে আসিয়াছিল, তাহারা কোন প্রকারেই দেশীয় লোকদিগের সহিত অভেদ হইয়া যায় নাই, তাহারা সমস্ত প্রকারেই এদেশে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে থাকে। কাজেই তাহাদিগকে আদর্শ করিয়া আমাদের মধ্যে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে ইহাও বলা যায় না।

তবে অবশ্য জাতিভেদ পূর্ব্বে যে আকারে ছিল, এখন তাহা না থাকিয়া, অন্য আকার ধারণ করিতেছে। একথা সত্য। যেমন ধর, পূর্ব্বে যদি কোন স্থানে সামাজিক নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে ভোজন হইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি পৃথক্‌ভাবে ভোজন করিত। এখন অন্যরূপ। এখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটাদি গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই একশ্রেণীতে ভোজন করেন; এইরূপ অপর যাহারাও কর্ম্মসূত্রে পরস্পর আবদ্ধ, তাহারা একত্র ভোজনাদি আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও, এক প্রকারের ভেদ ক্রমে উঠিয়া গিয়া, অন্য আর এক প্রকারের ভেদ ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

এইরূপ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা সকল দেশেই কর্ম্মগত-

ভেদেই জাতিভেদের মূল। তবে কর্ম্মগত ভেদ হইতে সূত্রপাত আরম্ভ হইলেই, ঐ ভেদকে বংশগত করিবার চেষ্টা সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে। যেমন ইংলণ্ডে লর্ডের পুত্র লর্ড হইবার প্রথা। মানুষের একটী প্রধান স্বভাব আত্মপ্রতিষ্ঠা। উহা দেশ-কাল-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে। পিতা যে সম্মান সমাজের নিকট পাইয়া আসিয়াছে, পৈত্রিক ধনাদির সহিত উত্তরাধিকার-সূত্রে, ঐ সম্মান সমাজের নিকট দাবী করিবার প্রবৃত্তি ও চেষ্টা সকল দেশেই বরাবরই চলিয়া আসিতেছে। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে যাহারা উক্ত সম্মান পাইবার উপযুক্ত নহে, সমাজের নিকট দাবীর সহিত সম্মান পাইবার উপযুক্ত নজীর যাহারা উপস্থিত করিতে পারে না, তাহারা ক্রমশঃ সেই সম্মানাধিকার হইতে, সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে ভ্রষ্ট হয়। অনুধাবন করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে এইরূপ প্রতিষ্ঠা ও অপ্রতিষ্ঠা মানব সমাজের সার্ব্বজনীন সার্ব্বকালিক নিয়ম। তবে মূলতঃ এক হইলেও, বিভিন্ন দেশে, জাতি ও চরিত্র ও আদর্শের বিভিন্নতানুসারে, এই ভেদ নানাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

তারপর আমাদের দেশে এখন ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাদি বলিয়া যে ভেদ তাহা উঠিয়া যাইবার আর একটী কারণ আছে। দেশের লোকের সর্ব্বসাধারণভাবে অধঃপতন হইয়াছে। এ অধঃপতনে ভারতীয় সমাজের ব্রাহ্মণাদি সমস্ত শক্তি লোপ, ও সার্ব্বজনীন শূদ্র শক্তির প্রভাব। দেশময় শূদ্র। ব্যক্তিবিশেষ সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত হইলেও বিরাট সমাজের তুলনায় নগণ্য। এমতাবস্থায়,

ক্রমশঃ, ব্রাহ্মণাদিরূপ জাতিভেদ লোপ সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় সাম্যবাদ ভ্রমজনক উপলক্ষ্যমাত্র। আমরা নিতান্ত ভ্রান্ত। কোন বিষয়েই গভীর ভাবে তলাইয়া দেখিতে অনভ্যস্ত। নতুবা কেবল পাশ্চাত্য সাম্যবাদকে উপলক্ষ্য করিয়া, সমাজের গুরুতর অবনতির বিষয় চিন্তা না করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা অস্বাভাবিক।

প্রকৃত সাম্য জ্ঞান কেবল প্রচার সাহায্যে উপলব্ধ হয় না। আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চাবস্থায় না উঠিলে সাম্যভাব লাভ করা অসম্ভব। সাম্যবাদেব অভাব আমাদের দেশে নাই। বরং এরূপ সার্ব্বভৌমিক সাম্যবাদ জগতে কখনও কোথাও হয় নাই।

শ্রুতি হিন্দুদিগের মূল শাস্ত্র। বেদান্ত এই শ্রুতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠাংশ। বেদান্ত প্রচার করিতেছেন সমস্ত জগৎ ব্রহ্মময়। কেবল মনুষ্যের মধ্যে নয়, সমস্ত জগতে আত্মদর্শন করিলে, বেদান্ত ধর্ম্মের চরম উপলব্ধি হয়। ইহাপেক্ষা সাম্যবাদ আর হইতেই পারে না। কিন্তু কেবল আদর্শ থাকিলেই হয় না; আদর্শ অনুসরণ করিবার উপযুক্ত অধিকারীর আবশ্যক। আমরা যদি উপযুক্ত হইতাম, তাহা হইলে আমাদের আদর্শের অভাব হইত না।

এ বিষয়ে গীতা হইতেও একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

বিদ্যা বিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

পঞ্চম অধ্যায়।

বিদ্যাবিনয়যুক্ত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তি, কুকুর, চণ্ডাল প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীতে তত্ত্বজ্ঞানীগণ সমদর্শী। তত্ত্বজ্ঞানী না হইলে প্রকৃতপক্ষে সমদর্শী হওয়া যায় না।

যিনি তত্ত্বজ্ঞানী না হইয়াও নিজকে সমদর্শী বলেন, তিনি ভাণ, অথবা নিজ মনকে ছলনা করেন মাত্র। কেবল মনুষ্যে সমদর্শী হওয়া ত দূরের কথা, হিন্দুশাস্ত্র অনুসরণ করিলে, সর্ব্ব-জীবে সমদর্শী হওয়া যায়। আমরা হই না, ইহা আমাদের দোষ। শাস্ত্রের দোষ নহে।

খাদ্য—বর্ত্তমানে অনেকে আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা লইয়াও নানা কথা কহিতেছেন। তাঁহাদের মতে আমাদের বর্ত্তমান খাদ্য-ব্যবস্থাই আমাদের অবনতির একটী প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য-জাতিগুলি আমিষাশী, আমরা এক প্রকার নিরামিষাশী, পাশ্চা-ত্যেরা উন্নত, আমরা অবনত; অতএব আমাদের নিরামিষ ভোজনই আমাদের অধঃপতনের প্রধান কারণ। স্থান কাল এবং পাত্রভেদে, নানাকারণসমবায়ে ব্যবস্থার বিভিন্নতা যে স্বাভাবিক তাহা ইঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না।

এই খাদ্যাখাদ্য অথবা জাতীয়-আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে যাঁহারা মতামত প্রকাশ করেন তাঁহাদিগের একটী বিষয় বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক ধারণা করা আবশ্যক। সমূহ বিজ্ঞানের

(science) ভিত্তি বহুদর্শিতালব্ধ-অভিজ্ঞতা (experiments)। বিজ্ঞানে প্রকৃতপক্ষে "কেন হয়" এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না; হইলেও বিজ্ঞান তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ। অম্লজান (oxygen) ও জলজান মিলিয়া জল হয়। কেন হয়, ইহার উত্তর নাই। বিজ্ঞানে "কেন" প্রশ্নের কেবল এক উত্তর—কেবল পারস্পর্য্য লক্ষ্য করা। উত্তাপে জল শুষ্কাইয়া যায়। কেন শুকায়? জলীয় অংশ বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া অদৃশ্যভাবে কমিয়া যায়—এই ইহার উত্তর। কিন্তু ইহাতে কি বলা হইল? জল উত্তাপে বাষ্প হয়, বাষ্পাকারে যাহা পরিণত হয়, তাহা জল হইতে পৃথক্ হইয়া যায়; কাজেই জলের অংশ কমিয়া যায়। ইহাতে উত্তাপে জল শুকান, একথাটী, স্থিরই রহিল। কেননা, ইহা বহুদর্শিতা-লব্ধ।

উত্তাপে জল বাষ্প হয়, এই কথাটী বলিয়া শুকানর পূর্ব্বের একটী অবস্থাকে লক্ষ্য করা হইল মাত্র। এইরূপেই বিজ্ঞান "কেন?"র উত্তর দিয়া থাকে। ইহাতে কেবল স্বাভাবিক নিয়মের পারম্পর্য্য-শৃঙ্খলাকেই (the links of the chain) চোখের সাম্‌নে ধরে। বিজ্ঞানের এই অনুভূতিও কেবল বহুদর্শিতার দ্বারাই (with the help of experiments) লব্ধ হয়। কাজেই বহুদর্শিতার ভিত্তি যত সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়, ততই তল্লব্ধ জ্ঞানের যাথার্থ্য সম্বন্ধেও ধারণা জন্মে।

হিন্দুরা যে কোন কালে আমিষ ভক্ষণ করে নাই এরূপ নহে। আমিষ ভক্ষণও করিয়াছে, উহার ফলাফলও লক্ষ্য

করিয়াছে। আবার নিরামিষ ও খাইয়া দেখিয়াছে। দেখিয়া, এদেশের লোকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কোনটী শ্রেয়ঃ, মোটের উপর লাভ কিসে বেশী, তাহা লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ নিরামিষাহার চল করিয়াছে। এই দেশে, এখানকার জলবায়ুতে নিরামিষাহার শ্রেষ্ঠ না হইলে, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই ব্যবস্থা অনুমোদিত হইয়া চলিয়া আসে নাই। যদি নিরামিষাহার, আমিষাহার হইতে বিশেষ লোভজনক হইত, তাহা হইলে বরং বলা যাইত যে হিন্দুগণ লোভের বশবর্ত্তী হইয়াই ওরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ নিরামিষাহার, আমিষাহার হইতে লোভজনক ত নহেই, বরং বহু সংযম ও লোভ দমন সাপেক্ষ। শ্রেয়ের সম্ভাবনা থাকিলেই আমরা প্রেয়কে ত্যাগ করিয়া, আত্মসংযম করতঃ, কখন কখনও শ্রেয়ঃকে বরণ করিয়া থাকি। নতুবা, অযথা প্রেয়কে ত্যাগ করিতে বলিলে মানুষ সে কথায় কাণ দিত না। যদি হিন্দুগণ কখনও আমিষাহার না করিত, তাহা হইলেও বরং এ কথা বলা সাজিত। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তাহা নয়। এ দেশের পুরাণ-স্মৃতি-কাব্য প্রভৃতিতে আমিষাহারের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অথচ নিরামিষাহার এদেশে ক্রমশঃ প্রচলিত হইয়া বহুশত বৎসর হইল প্রবর্ত্তিত ও সমর্থিত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে যে আমাদের দেশে নিরামিষাহার যে শ্রেষ্ঠ, ইহা বহুদর্শিতার দ্বারা প্রতিপন্ন, কাজেই বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠিত।

"Accumulated reasons of ages" যুগব্যাপীকালের মানব বুদ্ধি ইহাকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ, অন্যযুক্তির দ্বারাও ইহা আমরা প্রতিপন্ন করিতে পারি। মানবের খাদ্যের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী জিনিসের দরকার। একটী তাহার শরীরের ক্ষয় নিবারক ও অপরটী উত্তাপরক্ষক। ছানা জাতীয় খাদ্য (Proteids) শরীরের ক্ষয় নিবারণ করিয়া শরীরকে পুষ্ট রাখে। তৈল জাতীয় অথবা চিনিজাতীয় খাদ্য (Fats and Carbo-Hydrates) শরীরের উত্তাপ রক্ষা করে।

মাংস হইতে প্রধানতঃ প্রোটিড্ (Proteids) সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু এই প্রোটীড্ যে মাংস হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই।

যখন কোন জাতি সম্পূর্ণ অসভ্য ও বর্ব্বর থাকে তখন কাঁচা মাংসই খায়। অগ্নি-প্রজ্বলন ও রন্ধন করিবার কৌশল সম্বন্ধে প্রথমতঃ উহারা অজ্ঞ থাকে। ক্রমশঃ অগ্নি-প্রজ্বলন কৌশল শিক্ষা করে। তখন মাংস আগুনে ঝল্সাইয়া খায়। তারপর রন্ধন করিতেও শিক্ষা করে; তখন মাংস রাঁধিয়া খায়। মাংস কাঁচা খাইলে তৎসঙ্গে নানাপ্রকার রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া শরীরকে ব্যাধিগ্রস্ত করিতে পারে; এবং কাঁচা খাইলে খাদ্যদ্রব্য দুর্গন্ধযুক্ত ও আস্বাদহীন হয়। সেইজন্য সভ্য জাতিরা কাঁচা মাংস না খাইয়া, মাংস রন্ধন করিয়া খায়। অসভ্যজাতিদের পক্ষে মাংস

সংগ্রহ করাও বেশী কঠিন নয়। বনে জঙ্গলে যাইয়া পশুবধ করিলেই হইল।

উহাতে বিশেষ কোন বিদ্যার দরকার হয় না। তারপর যখন জাতিটী আরও উন্নত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মধ্যে ক্রমশঃ কৃষিবিদ্যার বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। খাদ্যের উপকরণ হিংসার দ্বারা সংগ্রহ না করিয়া তখন তাহারা অন্য উপায়েও সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। ক্রমশঃ মনুষ্যত্ব লাভ করায়, অযথা হিংসা উহাদের নিকট ক্রমশঃ অরুচিকর হইয়া উঠে। তখন আমিষাহার কমিয়া গিয়া, নিরামিষাহার প্রচলিত হইতে থাকে। আমিষে মনুষ্য-শরীর রক্ষণোপযোগী যে সমস্ত উপাদান আছে, নিরামিষে হিংসা না করিয়াও সে সমস্ত পাওয়া যায়। তবে ঐরূপভাবে খাদ্য সংগ্রহ কেবল সভ্য ও উন্নত জাতিরাই করিয়া থাকে; উহা কৃষিবিদ্যাসাপেক্ষ। মাংসে যে পরিমাণে প্রোটীড্ আছে, ছানা ও দাইলেও প্রোটীড্ প্রায় ঐ পরিমাণে আছে। ছানা ও দাইল খাইলে লাভের মধ্যে হিংসা করিয়া স্বভাবকে নিষ্ঠুর করিতে হয় না এবং নানাপ্রকার রোগ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়। যক্ষ্মা ও একপ্রকার জীবনহর-কৃমি-রোগের উৎপত্তি মাংসাহার হইতে হয়, এইরূপ পাশ্চাত্য-চিকিৎসাবিদেরা স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যক্ষ্মারোগের বীজাণু অনেক সময় খাদ্যের মাংস হইতে আসে। গরুর মাংসে ও শূকরের মাংসে এক প্রকার কৃমি কীটের উৎপত্তি হয়; উহা খাদ্যের

সহিত মনুষ্য শরীরে প্রবিষ্ট হইলে, এরূপ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায় যে, যাঁহারা জানেন না তাঁহারা শুনিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। ঐরূপ এক একটী কৃমি প্রায় দুই শত ফিট পর্য্যন্ত লম্বা হয় এরূপ দেখা গিয়াছে। ঐ কৃমি শরীরে প্রবেশ করিলে, ক্রমশঃ ক্ষীণ করিয়া মানুষকে মৃত্যুমুখে আনয়ন করে। তারপর, মাংস অতি শীঘ্রই পচিয়া উঠে, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে। আমাদের দেশে খুব টাটকা মাছ মাংস অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। মাংস পচিলেই উহার মধ্যে কীটাণু জন্মে। এবং ঐ সকল কীটাণু হইতে নানা প্রকার ব্যারাম হইতে পারে।

আর একটী কারণেও বিশেষ ক্ষতি হইতে পারে। যে সমস্ত প্রাণীর মাংস গ্রহণ করা হইয়া থাকে, উহারা স্পষ্টরূপে রোগ গ্রস্ত হইলে, অথবা রোগের বীজ প্রচ্ছন্নভাবে উহাদের মধ্যে থাকিলে যে সকল রোগ দ্বারা উহারা আক্রান্ত, যাহারা উহাদের মাংস গ্রহণ করে, তাহাদের মধ্যেও ঐ সমস্ত রোগ সংক্রামিত হইতে পারে।

অনেকে বলিবেন যে দাইল অপেক্ষা মাংস শীঘ্র হজম হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হজম সম্বন্ধে সেরূপ বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অভ্যাসবশতঃ যে যাহা খায়, সে তাহাই অনভ্যস্ত তত্তুল্য খাদ্যাপেক্ষা সহজে হজম করিতে পারে। ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রসম্মত।

উক্ত নানা কারণে যখন কোন জাতি ক্রমশঃ সুসভ্য হইতে

থাকে, তখন আমিষাহার ত্যাগ করিয়া, নিরামিষাহার গ্রহণ করিতে থাকে। গোদুগ্ধ ও তজ্জাত ঘৃত, ছানা, দধি ইত্যাদি নিরামিষাহার বলিয়াই আমরা গণ্য করিয়া থাকি। কোন প্রাণীকে হনন করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে হয় না; এবং মাংসের ন্যায় উহা দুর্গন্ধযুক্ত ও পচনশীল নয়।

উক্ত মতের পরিপোষকতা, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জাতিগুলিও করিতেছে। উহারা অতি অল্প দিন হইল সভ্য। কিন্তু ইহার মধ্যেই উহাদের অনেকেই নিরামিষাশী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বহু দিনের সংস্কার ও অভ্যাসগত লোভ সাম্‌লান বড় কঠিন কথা। কাজেই নিরামিষাহার প্রচলন হইতে বহু সময় লাগিবে। যে সকল পাশ্চাত্য দেশ অত্যন্ত শীতপ্রধান, সে সকল স্থানে, কৃষিজাত শস্য ফল মূলাদি পাওয়া নিতান্ত দুরূহ, ইহাও ঐ সমস্ত দেশে নিরামিষাহার প্রচলিত হওয়ার প্রতিকূল।

অনেকে বলিতে পারেন, ভারতবাসীরাই বা কি এমন উন্নত ও শিক্ষিত, যে তাহারা সেই জন্যই প্রধানতঃ নিরামিষাশী। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, ভারতবাসীরা বর্ত্তমানে উন্নত না হইলেও, পূর্ব্বে খুব উন্নত ছিল ইহা এখন একরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত। আমরা, অবশ্য, পূর্ব্বপুরুষলব্ধ বহুজ্ঞান লাভ করিতে পারি নাই। সে গুলি লুপ্ত হইয়াছে—আমরা তাহার পুনরুদ্ধারে অদ্যাপি অশক্ত। কিন্তু অন্যপ্রকার জ্ঞানকে লুপ্ত হইতে দিলেও, যে উপায়ে উদরপূর্ত্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইবে, তাহাকে লুপ্ত হইতে দেওয়াটা বড় অস্বাভাবিক। উহা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের সহিত

পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। কাজেই, আমরা উন্নত না হইলেও,আমাদের খাদ্য ব্যবস্থা ও প্রণালীটী উন্নত জাতিরই উদ্ভাবিত। তবে দুঃখের বিষয়, সেই প্রণালী অনুসারেও, অর্থাভাবে, আমরা খাওয়া জোটাইতে পারিতেছি না। উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত, দুগ্ধ, ছানা প্রভৃতির সংগ্রহ করা, আমাদের দেশের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণী-লোকের পক্ষে অসম্ভব।

নিরামিষাশীরা যে বলবান ও সামরিক জাতি হইতে পারে ইংরেজ রাজের সৈন্যগণও তাহার পরিচয় দিতেছে। শিখ ও গুর্খাগণ জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, উহাদিগকে আমরা নিরামিষাশী বলিতে পারি। উহারা যে মাংস গ্রহণ করে তাহা মোট খাদ্যের তুলনায় যৎকিঞ্চিৎমাত্র।

আমাদের মতে, উপরোক্ত প্রকারে, ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের মধ্যে নিরামিষাহার ক্রমশঃ প্রচলিত হইয়াছে। আবার, এ দেশের বর্ত্তমান অধঃপতনের সময়, ঐ আমিষাহার ও নিরামিষাহার হইতে, নানাপ্রকার কুসংস্কারেরও সৃষ্টি হইয়াছে। নিরামিষ খাইলেই ধার্ম্মিক, ও মাংস খাইলেই অধার্ম্মিক, এইরূপ কুসংস্কারও অনেকের মনে দৃঢ়মূল হইয়াছে। শিক্ষা-বাণিজ্যাদির জন্য বিদেশ গমন করিলে, বাধ্য হইয়া নানাপ্রকার মাংস খাইতে হয়। ঐ সমস্ত মাংস খাইলে, ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্ব, একেবারে চির জীবনের জন্য লোপ হইয়া যায়—এই প্রকারের কুসংস্কার, আমাদের সমাজের সমূহ ক্ষতি পূর্ব্বে করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

সংসারে চলিতে, লাভ ও ক্ষতি খতাইয়া দেখিতে হয়; মোটের উপর যাহাতে অধিক লাভ, অধিকমঙ্গল, তাঁহাই করিতে হয়।

সাত্ত্বিকতা—আজকাল আমাদের দেশে বহু লোকের বিশ্বাস, ভারতবর্ষ সাত্ত্বিকভাবের উন্মেষ ও বিকাশ করিবার চেষ্টাতেই যত অমঙ্গল টানিয়া আনিয়াছে। সাত্ত্বিক হওয়ার দরুণ হিন্দুরা অধঃপতিত হইয়াছে, কেন না রাজসিক লোকেই কর্ম্মী হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকতা ও তামসিকতার পার্থক্য সম্বন্ধে কোন বোধ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অবশ্য এরূপ কথা বলেন না। যে মহাতামসিকতায় ভারত আজ সমাচ্ছন্ন, তাহাই সাত্ত্বিক ভাব বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

প্রকৃত পক্ষে কর্ম্মিমাত্রেই তিন শ্রেণীর—সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক। অবশ্য মনুষ্য ইহজীবনেই আর একটী অবস্থার আস্বাদ পাইতে পারে, কিন্তু কর্ম্মবন্ধন থাকিতে সে অবস্থার আস্বাদ পাওয়া যায় না। প্রাচীন কালের উপনিষদাদিপ্রণেতা-ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রাম-কৃষ্ণ প্রভৃতি জগৎপূজ্য অবতার ও ধর্ম্মাচার্য্যগণ সকলেই এক-বাক্যে বলিয়া গিয়াছেন, যে কর্ম্মবন্ধনই জীবের দুঃখ ও অশান্তি-হেতু, ও কর্ম্মক্ষয়েই পরাশান্তি লাভ। মানুষমাত্রেই—এমন কি প্রাণিমাত্রেই—শান্তির জন্য ছুটাছুটি করিতেছে, এবং এই শান্তির উল্লাসে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে ধাবমান হই-তেছে। সমস্ত মনুষ্যজীবনের সকল চেষ্টা ও কর্ম্মের মূলে একই

কথা—শান্তি অন্বেষণ। যে ইহা স্বীকার না করে সে ভাণ অথবা আত্মপ্রতারণা করে মাত্র। যে সমস্ত মহাপুরুষগণকে (Martyrs), সদুদ্দেশ্যে নিজ স্বার্থ বলিদান দিতে দেখিতে পাই, তাঁহাদেরও কার্য্যের প্ররোচক একই জিনিষ—শান্তি অন্বেষণ। তবে তাঁহারা স্বার্থের গণ্ডী ভঙ্গ করিয়া পরার্থে জীবন উৎসর্গ করাতে, সেই পরাশান্তির অনেকটা নিকটবর্ত্তী, ইহাও বুঝিতে হইবে। যে কোন কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা হীন হইয়া করা যায় তাহাকেই প্রকৃত ত্যাগ বলে ; এবং এইরূপ ত্যাগের অভ্যাস হইতে ক্রমশঃ মানুষের কর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া আসে, ইহা সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মত। কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় হইলে মানুষ, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণেরই অতীত যে একটী অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাই ত্রিগুণাতীত পূর্ণানন্দময় পরাশান্তির অবস্থা। নতুবা তামসিক, রাজসিক, সাত্ত্বিক, এই তিন প্রকৃতির লোকই তাহার স্বভাবানুযায়ী হইয়া কর্ম্ম করিতে বাধ্য।

তবে এই তিন প্রকার কর্ম্মীর মধ্যে তামসিক কর্ম্মী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ সে উক্ত পূর্ণানন্দাবস্থা হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরস্থিত ; রাজসিককর্ম্মী তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ সে তামসিক কর্ম্মী অপেক্ষা অধিক নিকটবর্ত্তী ; এবং সাত্ত্বিককর্ম্মী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেন না সে সেই পূর্ণানন্দাবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা সন্নিকট। গীতাতে এই তিন প্রকার কর্ম্মীর লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধোহিংসাত্মকোহশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃকর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধশঠোনৈষ্কৃতিকোহলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘ সূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥

অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক, ২৬—২৮

অনাসক্ত, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহশীল, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি-বিষয়ে যে ব্যক্তি নির্ব্বিকার, তাহাকে সাত্বিক কর্ত্তা বলে।

আশক্তিজড়িত, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লোভী, হিংসাপরায়ণ, অশুচি, কার্য্যসাফল্যে অত্যন্ত হর্ষান্বিত ও অসাফল্যে অত্যন্ত শোকান্বিত কর্ত্তাকে, রাজস কর্ত্তা বলে।

যে, কোন বিষয়েই মনোনিবেশ করিতে পারে না, যাহার স্বভাব সংযত ও সংস্কৃত হয় নাই ও যে অবিনয়ী, শঠ, পরবৃত্তি-চ্ছেদনকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী, তাহাকে তামসকর্ত্তা বলে।

যেরূপ কর্ম্মী তিন প্রকারের আছে, সেইরূপ কর্ম্মও তিন প্রকারের আছে।

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্মযত্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে॥
যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামস মুচ্যতে॥

অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২৩—২৫

নিয়ত অনাসক্তভাবে, রাগদ্বেষশূন্য ও ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া, যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে।

ফলপ্রাপ্তি কামনায়, অথবা অহঙ্কার বশে, বহুকষ্টে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে।

ভাবী শুভাশুভ, ক্ষয়, পরপীড়া এবং নিজ সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া, মোহবশতঃ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলে।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় সমস্ত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য কর্ম্মেরই তিন প্রকার কর্ত্তা আছে। সমস্ত সাত্ত্বিক কর্ম্মই যে এক প্রকারের হইবে, তাহা নহে। কর্ত্তার গুণানুসারে কার্য্যে ছাপ পড়িবে। কর্ত্তা যে প্রকারের হইবে, কার্য্যটীও সেই শ্রেণীর হইবে। যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্য সাত্ত্বিকভাবে, রাজসিকভাবে, অথবা তামসিকভাবে কৃত হইতে পারে। যেমন ধর, স্বদেশসেবা। এই স্বদেশসেবার কোন কার্য্য পরিচালনা, যদি সাত্ত্বিক লোকের উপর ন্যস্ত হয়, তবে কর্ম্মটীও সাত্ত্বিক হইয়া উঠিবে; যদি রাজসিক লোক উহার পরিচালন ভার গ্রহণ করে, তবে কর্ম্মটীও রাজসিক হইয়া উঠিবে; আবার যদি ক্ষণিক উত্তেজনায় উত্তেজিত, কোন তামসিক লোকের প্রতি বিশেষ কোন কারণে (যেমন ধর, সে ধনী, এই কারণে) ঐ কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, তাহা হইলে কার্য্যটীও তামসিক হইয়া উঠিবে। তেমনি, আবার কোন সাধারণ কার্য্যও কর্ত্তাভেদে, সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক হইতে পারে।

চর্ম্মকারের কার্য্যও সাত্ত্বিক হইতে পারে, যদি কর্ত্তা সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়।

সাত্ত্বিক কর্ত্তা হওয়া যে কত কঠিন, তাহার লক্ষণ হইতে বুঝা যাইতেছে; কিন্তু ইহাও প্রকৃত, যে সমাজে যত অধিক পরিমাণে সাত্ত্বিক কর্ত্তা হইবে, সে সমাজের ততই মঙ্গল।

প্রত্যেক লোকের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম এক প্রকারের হইতেই পারে না। অথচ, গুণাতীত না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, না করিয়া নিস্তার নাই, তাহার পলাইয়া বাঁচিবার উপায় নাই। বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন কর্ম্ম হইতেই সমাজে কর্ম্ম বৈচিত্র দেখা যায়। যদি ভারতের কর্ম্ম বৈচিত্র্য অবস্থা সাত্ত্বিকভাব দ্বারা অনুস্যূত হইত, তাহা হইলে আজ তাহার এ দুর্দ্দশা হইত না। ঘোর তামসিকভাবে আচ্ছন্ন বলিয়াই এই অবস্থা।

সন্ন্যাস—অনেকের ধারণা যে সন্ন্যাসের আধিক্য ভারতের অবনতির একটী কারণ। যদি হিন্দুধর্ম্ম হইতে সন্ন্যাস উঠিয়া যাইত, তাহা হইলেই ভারতের মঙ্গল হইত। কিন্তু সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ যে কি, কি হইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। গৈরিকাদি লইলেই সন্ন্যাস হয় না। যে সন্ন্যাসের প্রশংসায় হিন্দুশাস্ত্র মুখর, যে সন্ন্যাসের উপযুক্ত হইলে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ঊর্দ্ধতম সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ উদ্ধার হইয়া যায়, উহার প্রকৃত অর্থ অনেকেই জ্ঞাত নহেন; নতুবা সন্ন্যাস সম্বন্ধে এরূপ কিম্ভূত কিমাকার ধারণা তাঁহাদের থাকিত না।

মানুষ যতক্ষণ তাহার পাঞ্চভৌতিক দেহকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, ততক্ষণ সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার স্বভাববশতঃই তাহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। তবে সকলকেই এক প্রকার অথবা একই পরিমাণ কর্ম্ম করিতে হয় না। প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন মনুষ্যের বিভিন্ন কর্ম্ম। এবং সামান্যবিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, প্রত্যেক কর্ম্মই দোষ মিশ্রিত।

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ॥

গীতা, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৪৮

হে কৌন্তেয়, স্বভাববিহিত কর্ম্ম দোষান্বিত হইলেও পরিত্যাগ করিবে না; যেহেতু ধূম দ্বারা যেরূপ অগ্নি আবৃত থাকে, তদ্রূপ সকল কার্য্যই দোষাবৃত থাকে!

ভগবান আবার বলিতেছেন।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ॥

অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৬০

হে কৌন্তেয়, করিতে ইচ্ছা না করিলেও, সংস্কারের দ্বারা যে কর্ম্ম তোমার স্বভাবে নিহিত আছে, তাহা তোমাকে অবশ হইয়া করিতে হইবে।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে কর্ম্ম প্রত্যেককে করিতে হইবে; না করিয়া উপায় নাই। অথচ এমন কর্ম্মই নাই যাহা একেবারে দোষশূন্য।

তা হ'লে উপায়? এ কর্ম্ম শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার উপায় কি? মুক্ত হইবার উপায় সন্ন্যাস। সন্ন্যাস লাভ হইলে তৎপর ব্রহ্মলাভের চেষ্টা ফলবতী হয়।

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা॥

গীতা, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ৪৯—৫০

সন্ন্যাস দ্বারা যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আসক্তি রহিত, বিগতস্পৃহ ও নিরহঙ্কার হইয়াছে, তাহার নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ নিবৃত্তিপথ লাভ হয়।

হে কৌন্তেয়, নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবার পর, যে প্রকারে শ্রেষ্ঠজ্ঞান ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সন্ন্যাসের দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সিদ্ধি ও তাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মানুষ দুঃখ কষ্টের জ্বালা যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া চির-শান্তির অধিকারী হয় ও নিরবচ্ছিন্ন পরমানন্দ লাভ করে। ব্রহ্মজ্ঞানের পথে লইয়া যায় বলিয়া সন্ন্যাসের এত আদর। তাহা ত হইবারই কথা। এই সন্ন্যাসের অর্থ কি দেখা যাক্।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

গীতা, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক ২

কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকে পণ্ডিতেরা সন্ন্যাস বলেন; এবং সকল কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির ইচ্ছা পরিত্যাগকেই ত্যাগ বলিয়া থাকেন। কাজেই সন্ন্যাস ও ফলাকাঙ্ক্ষাহীন কর্ম্ম একই কথা।

সমাজের যত অধিক লোক সন্ন্যাসী হয়, যত অধিক লোক ফলাকাঙ্ক্ষাহীন হইয়া কর্ম্ম করিতে শিক্ষা করে ততই সমাজের মঙ্গল, ততই সমাজের শুভকর্ম্মগুলি টিকিয়া যায়। সামান্য কিছু করিয়াই, একটা বৃহৎ ফলাকাঙ্ক্ষা ও একটা কিছু হইয়া বসিবার ইচ্ছা, কিরূপে আমাদের সমাজের শুভকর্ম্মগুলিকে নষ্ট করিয়া দিতেছে, যাঁহারা এ বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন। গীতা প্রদর্শিত উক্ত সন্ন্যাস পথ প্রত্যেক কর্ম্মীর পক্ষেই উন্মুক্ত রহিয়াছে। কসাই কিম্বা চর্ম্মকারও তাহার কর্ত্তব্য অনাসক্ত হইয়া করিতে সমর্থ হইলেই সন্ন্যাসী বলিয়া গণ্য। ইহাতে কোন কার্য্যের অপেক্ষা রাখিতেছে না; কার্য্য করিবার প্রণালী লইয়াই কথা।

ভারতের আলোক।

এস ভারতের আলোক—ব্রাহ্মণ, এস—এস তুমি। এস—আবার এস, ভারতগগন ধাঁধিয়া এস! এস ভারত-মুকুটমণি, জ্ঞানবৈরাগ্যখণি, এস তুমি—লয়ে নূতন বাণী। হে দরিদ্র, হে ভিক্ষুক; হে ভূদেব, হে অর্থপতি; হে মৌনী, হে বাচাল—এস তুমি! ওহে তৃণ হ'তেও সুনীচ, এস তোমার বিনয়,তোমার নম্রতা নিয়ে এস। ওহে হিমালয়চূড়া হ'তেও গর্ব্বিত, এস তোমার গর্ব্ব, তোমার দৃঢ়তা নিয়ে এস। এই স্বার্থের যুগে, ভোগলালসার ঘর্ঘরধ্বনি, অর্থের ঝন্ঝনাণি ভেদ করিয়া, তোমার ত্যাগের শান্ত-সংহত-গম্ভীর-ধ্বনি বাজিয়া উঠুক! এই ঘূর্ণায়মান, এই সতত চঞ্চল, এই উদ্‌ভ্রান্ত সমাজের স্থির কেন্দ্র-স্থল তুমি—তুমি না জাগিলে চলিবে কেন?

এত দিন তুমি সমাজকে রক্ষা করিয়া আসিলে—আজ কি তুমি অপারগ হইবে? কত ঝড় গেল, কত ভূকম্পন গেল, কত বিপ্লব, কত বন্যা প্রবাহিত হইল, কই তোমার হস্ত ত কাঁপে নাই?—তুমি ত দৃঢ়চিত্ত; স্থিরহস্তে এ তরণির হাল এতকাল ধরিয়া আসিয়াছে—আজ তুমি দুর্ব্বল হইবে? পুরুষানুক্রমে কাল প্রবাহ তোমার শিরায় শিরায় জ্ঞান বৈরাগ্যের রক্ত বহিয়া

আনিয়াছে—আজ কি তাহা নিশ্চল হইয়া যাইবে? নাচুক ব্রাহ্মণ, তোমার ধমণি আবার নাঁচিয়া উঠুক! উঠুক ব্রাহ্মণ, তোমার বীর্য্যের মন্ত্র, আবার ভারতগগন ঝলসিয়া উঠুক! আবার ভোগান্ধ, লুব্ধ-মদমত্ত-জগৎ তোমার ত্যাগের, তোমার ঐশ্বর্য্যের স্পর্দ্ধায় শিহরিয়া উঠুক!

ওহে, বাল্মিকী-বশিষ্ঠ-ব্যাস-কপিল-পতঞ্জলি-বংশধর, ওহে শুক-শঙ্কর-রামানুজ-চৈতন্যের সম্প্রদায়, তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইলে কেন? দেখ, যখনি ভারত সমাজে অশান্তিবহ্নি জ্বলিয়াছে, তুমি তখনি তোমার কমণ্ডলুবারি-প্রক্ষেপে তাহা নিবাইয়া শান্তি-ধারা বহাইয়াছ; তোমার তপঃক্লিষ্ট, শীর্ণঅস্থি বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছে, আর আজ কি তুমি এতই শিথিল? ওঠ, জাগ, আর আত্মবিস্মৃত থাকিও না—আবার তোমার বাণী শুনিবার জন্য ভারত উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তুমিই ভারত সমাজ স্থাপন করিয়াছিলে—নিজে ভিক্ষাসম্বলমাত্র হইয়া। কই, ধনবল ত তুমি কোন দিনই গণ্য কর নাই—আজ কি তুমি তাহা গণ্য করিবে?

ভারতের গ্রামে গ্রামে, ভিক্ষাসম্বল তুমি, এতকাল জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছে—আজ কি তাহা পারিবে না? তুমি না পারিলে এ দুঃসহ ব্রতভার কে বহন করিবে? এখনও সে কঠোরতা, সে ত্যাগ, সে নিষ্ঠা, সে তেজস্বিতা, তোমারই আছে—এত দিনও তুমি ভারতপ্লাবি-বিলাস-মোহকে পদাঘাতে ফিরাইয়া দিয়াছ, এত দিনও তুমি প্রবল সাগরের সহিত যুঝিতেছ!

কিন্তু হে ব্রাহ্মণ, একবার তোমার নিষ্ঠার সহিত, তোমার দাঢ্যের সহিত, তোমার তেজের সহিত, তোমার মহীয়ান্ কৌশলের সহিত নূতন কৌশল যোজনা করিয়া দাও, একবার হটিয়া হটাইবার চেষ্টা কর, একবার তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর কৌশল জানিয়া লও—তাহা হইলে আবার তোমার ব্রত তুমি পালন করিতে পারিবে। ব্রাহ্মণ, পাশ্চাত্যজ্ঞান একবার ঘাঁটিয়া লও, উহাকে হজম করিয়া ফেল—সে ক্ষমতা কেবল তোমারই আছে। ব্রাহ্মণ, সাবধান! দাঢ্যের মূর্ত্তিতে সঙ্কীর্ণতা তোমাকে আক্রমণ করিতেছে, তেজের মূর্ত্তিতে মিথ্যাহঙ্কার তোমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। হায়! যে বেদান্তের সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছিল তাহাকে সঙ্কীর্ণতা স্পর্শ করিতেছে —ইহা কি তুমি দেখিতেছনা? একবার তোমার প্রতীচ্য ছাঁচে পাশ্চাত্যশিক্ষা ঢালাই করিয়া লও, তাহা হইলেই আমরা ভারতে সুদিন দেখিতে পাইব। আমাদের সে আশা কি ব্যর্থ হইবে?

সমাপ্ত।